জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
GENETICS AND EVOLUTION

১১ অধ্যায়

জীবের অন্যতম সহজাত ধর্ম হলো জনন। যার সাহায্যে জীব তার অপত্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। জননের মাধ্যমে সৃষ্ট অপত্য জীবে তার পিতামাতা বা জনিতৃ জীবের বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে **বংশগতি** বা **উত্তরাধিকার** (heredity or inheritance) বলে। অপত্য জীবে পিতামাতার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেলেও কখনই পিতামাতার মতো হুবহু সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ হলো **প্রকরণ** বা **বিভেদ** (variation)। প্রকরণের কারণেই একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কিংবা একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। জীবের নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে বংশগতি ও প্রকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ঘটনা বিবর্তন বা অভিব্যক্তির (evolution) সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ অধ্যায়ে জীবের জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

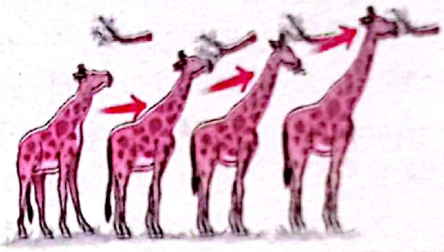

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ১৫)
১. মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স ○ মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র।
২. ইনহেরিট্যান্স-এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● ইনহেরিট্যান্স এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব
৩. মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম ○ অসম্পূর্ণ প্রকটতা, ○ সমপ্রকটতা ○ লিথাল জিন, ○ পরিপূরকজিন, ○ এপিস্ট্যাসিস
৪. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্টস
৫. লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● লিঙ্গ নির্ধারণ (XX-XY-, XX-XO) নীতি
৬. সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার- ○ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া
৭. রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ○ রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা ○ গর্ভধারণজনিত জটিলতা
৮. বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা ● বিবর্তনের মতবাদ
৯. বিবর্তনের মতবাদসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	○ ল্যামার্কিজম, ○ ডারউইনিজম, ○ নব্য ডারউইনবাদ
১০. বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● বিবর্তনের প্রমাণাদি
১১. প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।	

CamScanner

মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স (Mendelian Inheritance)

জিন ও জিনতত্ত্ব (Gene and Genetics)

চরিত্র নির্ধারক যে সত্তা বংশগতির ভিত্তি তৈরি করে তাকে আমরা বলি জিন (Gene)। **W.L Johansen** (1909) এই সত্তাকে জিন নামে অভিহিত করেন। **William Bateson** (1905) Genetics কথাটি প্রবর্তন করেন। গ্রিক *genesis* শব্দ হতে Genetics এর উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়া (to become) বা উদ্ভূত হওয়া (to grow into)। তাই জিনতত্ত্বের একটি সার্বিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয় 'জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কার্যপদ্ধতি ও তার বংশানুক্রমিক পদ্ধতি ও ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্ব** (Genetics) বা **সুপ্রজননবিদ্যা** বা **কৌলিতত্ত্ব** বলে'। এই বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর যিনি স্থাপন করেছেন তিনি হলেন **গ্রেগর জোহান মেন্ডেল** (Gregor Johann Mendel, 1822-1884)।

মেন্ডেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী (Short life history of Mendel)

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (22 July, 1822) অস্ট্রিয়ায় এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের কারণে যৌবনে তিনি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত ও কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। 1840 খ্রিস্টাব্দে তিনি Gymnasium থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। 1843 খ্রিষ্টাব্দে **অস্ট্রিয়ার ব্রুন** শহরে এক সন্ন্যাস আশ্রমে তিনি শিক্ষানবিশ হিসেবে ভর্তি হন এবং গ্রেগর উপাধিতে ভূষিত হন।

অতঃপর প্রকৃতিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য তাঁকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে সন্তোষজনক ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হন। 1854 খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রুনে ফিরে আসেন এবং বিকল্প বিজ্ঞান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। মেন্ডেল 1857 খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন জাতের (৩৪ প্রকার) **মটরশুঁটি** (Pea, *Pisum sativum*) উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন এবং গির্জা সংলগ্ন বাগানে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং দুটি সূত্র আবিষ্কার করেন।

Gregor Johann Mendel
(1822-1884)

মেন্ডেল মটর গাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জীবের বংশগতির কোষীয় পদ্ধতি বিষয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রণয়ন করেন সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে **মেন্ডেলবাদ** বা **মেন্ডেলিজম** (mendelism) বলে। মেন্ডেলের বংশগতির তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জিনতত্ত্ব বা সুপ্রজননবিদ্যা হলো **মেন্ডেলীয় সুপ্রজননবিদ্যা** বা **ট্রান্সমিশন জেনেটিক্স** (Mendelian or Transmission Genetics)। 1866 খ্রিষ্টাব্দে মেন্ডেল প্রকাশিত বংশগতি নির্ধারক সূত্রাবলি বংশগতি বিজ্ঞানের সূচনা করে।

বাগানের মিষ্টি মটরশুঁটি গাছের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তার আবিষ্কৃত মৌলিক সূত্রগুলো **'Experiments on plant hybridization শিরোনামে Journal of Natural History Society'** পত্রিকায় 1866 খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তদানীন্তনকালের বিজ্ঞানীরা তাঁর আবিষ্কারকে কোনো গুরুত্ব দেননি। ফলে প্রায় ৩৪ বছর মেন্ডেলের বংশগতিসংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা গুরুত্ব পায়নি। মেন্ডেল 1884 খ্রিস্টাব্দে 6 January মৃত্যুবরণ করেন।

মেন্ডেল মারা যাওয়ার ১৬ বছর পরে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে নেদারল্যান্ডসের উদ্ভিদবিজ্ঞানী **হিউগো দ্য ভ্রিস** (Hugo de Vries, 1848-1935), জার্মানির উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক **কার্ল কোরেন্স** (Carl Correns, 1864-1933) ও অস্ট্রিয়ার কৃষিবিজ্ঞানী **এরিখ ভন চেরম্যার্ক** (Erich von Tschermark,1871-1962) পৃথকভাবে গবেষণা করে মেন্ডেল বর্ণিত বংশগতির সূত্রগুলোর সত্যতা উপলব্ধি করেন। তাঁদের গবেষণা যেন মেন্ডেলের আবিষ্কারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটালো। এ কারণে হিউগো দ্য ভ্রিস, কার্ল কোরেন্স ও এরিখ ভন চেরম্যাকের আবিষ্কারকে **মেন্ডেলের পুনরাবিষ্কার** (Rediscovery of Mendel) বলে। অতঃপর 1901 খ্রিষ্টাব্দে মেন্ডেলের মূল গবেষণাপত্রটি **'Flora'** জার্নালে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

এরপর মেন্ডেলের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায় ও ক্রমে ক্রমে বংশগতি বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। মেন্ডেলের অবদানে বংশগতি বিজ্ঞান দিগন্তে প্রসারিত হওয়ায় তাঁকে **বংশগতিবিদ্যার জনক** (Father of Genetics) বলা হয়।

জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Genetics)

১। উন্নত প্রজন্ম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের জন্য মানুষ বংশগতিবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে।

২। বর্তমানে উদ্যানবিদ্যা, প্রাণী-সংরক্ষণ প্রকল্প এবং কৃষিকাজে বংশগতিবিদ্যা বিপ্লব সাধন করেছে।

CamScanner

৩। মানুষের ক্ষেত্রেও বংশগতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বংশগতিবিদ্যা অনেকাংশে সাহায্য করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

৪। বংশগতি সম্বন্ধে যেসব অলীক ও ভ্রান্ত ধারণা এতকাল মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার অবসান সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে জিন প্রযুক্তিবিদ্যা (Genetic engineering) মানুষের একাধিক সমস্যা সমাধানে হাতিয়ার রূপে কাজ করবে।

মানব কল্যাণে জিনতত্ত্বের ভূমিকা (Roles of Genetics in Human Welfare)

জিনতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগিক শাখা। মানব কল্যাণে এর গুরুত্ব অনেক। যেমন–

১। জীবদেহে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি, প্রকরণ ও বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জিনতত্ত্বের মাধ্যমে জানা যায়।

২। জিনতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করে হাইব্রিডাইজেশন (hybridization) পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু ও মাছ সৃষ্টি করা যায়।

৩। জিনতত্ত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগ যেমন– বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, অ্যালবিনিজম ইত্যাদির প্রকৃত কারণ জানা ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

৪। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম ফসলের জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

৫। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, ভ্যাকসিন, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়।

৬। অপরাধী শনাক্তকরণ ও পিতৃমাতৃ সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য জিন প্রযুক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়।

৭। জিনতত্ত্বের জ্ঞানের আলোকে উচ্চশ্রেণির প্রাণীর ডিপ্লয়েড দেহকোষ থেকে ক্লোনিং পদ্ধতিতে প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

বংশগতিসংক্রান্ত কতগুলো পরিভাষা (Several Terminology of Heredity)

১। **জিন বা ফ্যাক্টর (Gene or Factor) :** জিন হলো জীবকোষে বিদ্যমান বংশগতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক, ভৌত ও কার্যিক একক যা বংশ থেকে বংশান্তরে স্থানান্তরিত হয়। সংক্ষেপে, একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির নির্দেশ প্রদানকারী DNA-এর অংশবিশেষই জিন। প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য সাধারণত ১ জোড়া জিন দায়ী। কখনও একাধিক জিন দায়ী হতে পারে। মেন্ডেল এদেরকে ফ্যাক্টর (factor) বা কণা (Particle) নামকরণ করেছিলেন। জোহানসেন (১৯০৯) সর্বপ্রথম এই ফ্যাক্টরগুলোকেই 'gene' নাম দেন।

২। **লোকাস (Locus) :** হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের যে অবস্থানে বা বিন্দুতে জিন অবস্থান করে, ওই অবস্থানকে বা বিন্দুকে ওই জিনের লোকাস বা **জিন লোকাস** বলে। একটি নির্দিষ্ট জিনের অ্যালিলগুলো সমসংখ্য ক্রোমোজোমের একই লোকাটস অবস্থান করে।

৩। **হোমোলোগাস ক্রোমোজোম :** একই আকৃতি ও একই জিনের সজ্জারীতি সম্পন্ন দুটি ক্রোমোজোম যাদের একটি পিতা ও অন্যটি মাতা হতে আগত তাদের হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোম বলে।

৪। **অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ (Allele/Allelomorph) :** হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত এক জোড়া জিন যদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তাদের পরস্পরের অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ বলে। সংক্ষেপে কোনো বৈশিষ্ট্য বা চারিত্রসাপেক্ষে একটি জিনের বিভিন্ন রূপভেজকে অ্যালিল বলে। যখন দুটি বিপরীত ধর্মী অ্যালিল থাকে তখন একটিকে প্রকট অ্যালিল (T); অন্যটিকে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (+) বলে। অ্যালিলদ্বয় একইধর্মী (যেমন– TT) অথবা একে অপরের বিপরীতধর্মী (যেমন– Tt) হতে পারে। অনেকের মতে, জিনদ্বয়ের একত্রে থাকার অবস্থাকে অ্যালিলোমর্ফ বলে। ৫। **নন-অ্যালিল (Non-alleles) :** পৃথক জিন লোকাস বা লোকাসে (বহুবচনে-লোসাই) অবস্থিত জিন বা ফ্যাক্টর বা অ্যালিল সমূহকে নন-অ্যালিল বলে।

৬। **হোমোজাইগাস (Homozygous) :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন দুটি (অ্যালিল) সমপ্রকৃতির হলে সে বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই জীবকে হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ বলে। যেমন– মটরশুঁটি গাছের লম্বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি জিনই যদি TT হয় তবে ওই বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই জীবকে হোমোজাইগাস লম্বা বলা হয়।

৭। **হেটারোজাইগাস (Heterozygous) :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন দুটি অসম প্রকৃতির হলে সে বৈশিষ্ট্যের জন্য ওই জীবকে হেটারোজাইগাস বলে। মেন্ডেলের সূত্রানুসারে হেটারোজাইগাস অবস্থায় কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে। যেমন, Tt লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য হেটারোজাইগাস।

৮। **হেমিজাইগাস (Hemizygous) :** যদি কোনো জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে একটি মাত্র জিন থাকে তবে তাকে হেমিজাইগাস অবস্থা বলা হয়।

৯। **পানেট স্কয়ার (Punnet square) :** বংশগতির পরীক্ষা ও গবেষণা করার সময় ফলাফল রেকর্ড করার জন্য যে ছকের ব্যবহার করা হয় তাকে পানেট স্কয়ার বা **চেকার বোর্ড** বলে।

CamScanner

১০। প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) : এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটো জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে যে বৈশিষ্ট্যটি বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন– হোমোজাইগাস লম্বা ও খাটো মটরশুঁটি গাছের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1) সব গাছ লম্বা হয়। এখানে লম্বা বৈশিষ্ট্যটি খাটো বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট।

১১। প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) : এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটো জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1) যে বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন– হোমোজাইগাস লম্বা ও খাটো মটরশুঁটি গাছের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; কিন্তু খাটো বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে। এখানে খাটো বৈশিষ্ট্যটি লম্বা বৈশিষ্ট্যের নিকট প্রচ্ছন্ন।

১২। ফিনোটাইপ (Phenotype) : জীবের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণই হলো তার ফিনোটাইপ। যেমন– মটরশুঁটি গাছ লম্বা বা খাটো হতে পারে যা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়; এ লম্বা বা খাটো বৈশিষ্ট্যই হলো তার ফিনোটাইপ।

১৩। জিনোটাইপ (Genotype) : কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন সমষ্টিকে ওই জীবের ওই বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ বলে। মেন্ডেলের মতে, জীবের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিককালে প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি বৈশিষ্ট্য একাধিক জোড়া জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেমন– মটরশুঁটি গাছের খাটো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন হলো t। সুতরাং বিশুদ্ধ মটরশুঁটি গাছের খাটো বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ হলো tt।

১৪। চরিত্র বা ট্রেইট (Trait) : দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যকে একত্রে একটি চরিত্র বা ট্রেইট বলা হয়। চরিত্র বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। যেমন- মটর গাছের কাণ্ড লম্বা হওয়া ও খাটো হওয়া বৈশিষ্ট্য দুটি কাণ্ডের দৈর্ঘ্য চরিত্রটির অন্তর্গত।

১৫। একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) : এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো **একসংকর ক্রস** বা **মনোহাইব্রিড ক্রস**। যেমন– লম্বা ও খাটো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো মনোহাইব্রিড ক্রস।

১৬। দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) : দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো **দ্বিসংকর ক্রস** বা **ডাইহাইব্রিড ক্রস** । যেমন– গোলাকার ও হলুদ বর্ণের বীজ বিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো ডাইহাইব্রিড ক্রস।

১৭। সংকর জীব (Hybrid) : দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে প্রজননে সৃষ্ট সন্তানদের সংকর জীব বলে। অথবা দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মিলনের ফলে মিশ্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে জীবের সৃষ্টি হয় তাকে সংকর বা সংকর জীব বলে। সংকর জীব সর্বদা হেটারোজাইগাস প্রকৃতির। বিশুদ্ধ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জীবদের সংকরায়ণে সৃষ্ট প্রথম সন্তানদের F_1 জনু বা **প্রথম সংকর পুরুষ** (First filial generation) বলে। F_1 জনুর সংকর জীবদের মধ্যে অন্তঃপ্রজননে সৃষ্ট জীবদের F_2 জনু বা **দ্বিতীয় সংকর পুরুষ** (Second filial generation) বলে।

১৮। জনিতৃ জনু বা P জনু (Parental generation or P generation) : একসংকর বা দ্বিসংকর জনন পরীক্ষার শুরুতে যে দুটি জীবের মধ্যে প্রজনন ঘটানো হয়, তাদের জনিতৃ জনু বা P জনু বলে।

১৯। সংকরায়ণ (Hybridization) : সাধারণভাবে কোনো চরিত্র সাপেক্ষে বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি জীবের মিলনকে সংকরায়ণ বলে। একটি চরিত্রের জন্য বিপরীতধর্মী দুটি জীবের মিলনকে একসংকরায়ণ বলে। আবার দুটি চরিত্রের জন্য বিপরীতধর্মী দুটি জীবের মিলনকে দ্বিসংকরায়ণ বলা হয়।

২০। ক্রস (Cross) : বিপরীত লিঙ্গধারী দুটি জীবের মিলনকে ক্রস বলে।

২১। ব্যাক ক্রস (Back cross) : অপত্য বংশের (F_1 জুন) জীবের সাথে পিতামাতার যেকোনো বৈশিষ্ট্যের ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলা হয়। যেমন- $Tt \times TT$ অথবা $Tt \times tt$।

২২। টেস্ট ক্রস (Test cross) : অপত্য বংশের জীবের সাথে (F_1 বা F_2 বা F_3 ইত্যাদি) তার প্রচ্ছন্ন পিতামাতার ক্রসকে টেস্ট ক্রস বলে। যেমন– $Tt \times tt$। কোনো জীব হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য এ পরীক্ষা করা হয়। যেমন- সংকর লম্বা মটরগাছ (Tt) এবং বিশুদ্ধ খাটো মররগাছ (tt) এর সংকরারন ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপক অনুপাত হবে ১ঃ১।

২৩। জিনোম (Genome) : কোনো প্রজাতির জীবের এক সেট হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। অথবা ডিপ্লয়েড জীবের হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সেটে যেসব জিন থাকে তাদের একত্রে জিনোম বলা হয়। অথবা জীবের একটি জননকোষের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে।

২৪। সেক্স ক্রোমোজোম (Sex chromosome) : যেসব ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বলে। যেমন– মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে মাত্র এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম। এদের X ও Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের কোন জাইগোটে (ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণকোষ) XY থাকলে পুত্র সন্তান এবং XX থাকলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়।

২৫। অটোজোম (Autosome) : যেসব ক্রোমোজোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তাদের অটোজোম বলে। যেমন, মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়াই অটোজোম। এদের A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

CamScanner

মেন্ডেলের পরীক্ষা (Experiment of Mendel)

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল মটর গাছের ৭ জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করে তার ভিত্তিতে বংশগতি সম্পর্কিত একসংকর ও দ্বিসংকর প্রজনন পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করেন। সেইসব পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি যথাক্রমে **পৃথকীকরণের সূত্র** (Law of Segregation) ও **স্বাধীন বিন্যাস বা স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র** (Law of Independent Assortment) প্রণয়ন করেন। এ সূত্র দুটি বর্তমানে **মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র** (Mendel's Law of Heredity) নামে পরিচিত।

মেন্ডেলের মটরশুঁটি গাছ নির্বাচনের কারণ

মেন্ডেল তাঁর বংশগতির পরীক্ষার জন্য বাগানের মিষ্টি মটরশুঁটি গাছে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য মটরশুঁটি উদ্ভিদকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

১। মটরশুঁটি গাছ দ্রুত বংশবিস্তারে সক্ষম, তাই অল্প সময়ের মধ্যে বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব।
২। মটরশুঁটি গাছ সহজে বাগানে ও টবে চাষ করা যায়।
৩। মটরশুঁটি গাছে অনেক বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে।
৪। মটরশুঁটি গাছ বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশুদ্ধ অপত্য উদ্ভিদ উৎপাদনে সক্ষম হয়।
৫। মটরশুঁটি গাছের ফুল উভলিঙ্গ হওয়ায় স্বপরাগযোগ ঘটে।
৬। মটরশুঁটি ফুল স্বপরাগী হওয়ায় বাইরের কোনো অবাঞ্ছিত চরিত্র মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৭। এর আয়ুষ্কাল স্বল্প হওয়ায় খুব দ্রুত সংকরায়ণের ফল লাভ করা যায়।
৮। সংকর গাছগুলো পুরোপুরি জননে সক্ষম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

মেন্ডেলের গবেষণায় মটরশুঁটি গাছের সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য

চরিত্র (Characters)	বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য	
	প্রকট (Dominant)	প্রচ্ছন্ন (Recessive)
১. বীজের আকার (Seed shape)	গোল (Round)	কুঞ্চিত (Wrinkled)
২. বীজের রং (Seed colour)	হলুদ (Yellow)	সবুজ (Green)
৩. মটরশুঁটির আকার (Pod shape)	স্ফীত (Inflated)	সংকুচিত (Constricted)
৪. কাঁচা মটরশুঁটির রং (Pod colour)	সবুজ (Green)	হলুদ (Yellow)
৫. ফুলের রং (Flower colour)	বেগুনি (Violet)	সাদা (White)
৬. ফুলের অবস্থান (Flower position)	পার্শ্বস্থ (Axial)	শীর্ষস্থ (Terminal)
৭. কাণ্ডের দৈর্ঘ্য (Length of stem)	লম্বা (Tall)	খাটো (Dwarf)

মেন্ডেলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল

সংখ্যা	ক্রসের ধরন	প্রথম বংশধর (F_1 জন্য)	দ্বিতীয় বংশধর (F_2 জন্য)	প্রকৃত অনুপাত
১.	গোলাকার বীজ × কুঞ্চিত বীজ	গোলাকার বীজ	৫,৪৭৪ গোলাকার, ১৮৫০ কুঞ্চিত	২.৩৬ : ১
২.	হলুদ বীজপত্র × সবুজ বীজপত্র	হলুদ বীজপত্র	৬,০২২ গোলাকার, ২,০০১ সবুজ বীজপত্র	৩.০১ : ১
৩.	রঙিন বীজাবরণ × সাদা বীজাবরণ	রঙিন বীজাবরণ	৭০৫ রঙিন, ২২৪ সাদা	৩.১৫ : ১
৪.	স্ফীত ফল × খাঁজযুক্ত ফল	স্ফীত ফল	৮৮২ স্ফীত, ২২৯ খাঁজযুক্ত	২.৯৫ : ১
৫.	সবুজ ফল × হলুদ ফল	সবুজ ফল	৪২৮ সবুজ, ১৫২ হলুদ	২.৮২ : ১
৬.	কাক্ষিক পুষ্প × শীর্ষক পুষ্প	কাক্ষিক পুষ্প	৬৫১ কাক্ষিক, ২০৭ শীর্ষক	৩.১৪ : ১
৭.	দীর্ঘকাণ্ড × খাটো কাণ্ড	দীর্ঘকাণ্ড	৭৮৭ দীর্ঘকাণ্ড, ২৭৭ খাটো কাণ্ড	২.৮৪ : ১

মেন্ডেলের গবেষণায় সফলতার কারণ

মেন্ডেলের পূর্বে বংশগতি বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা সম্পাদিত হলেও মেন্ডেলই সর্বপ্রথম সাফল্য অর্জন করেন এবং বংশগতি বিষয়ক তত্ত্ব প্রবর্তনে সক্ষম হন। মেন্ডেলের উক্ত সাফল্য অর্জনের প্রধান কারণসমূহ হলো–

১। **সৌভাগ্যক্রমে** মেন্ডেলের পরীক্ষায় ব্যবহৃত উদ্ভিদগুলো ছিল বিশুদ্ধ অর্থাৎ হোমোজাইগাস।

২। সংকরায়ণের পূর্বে **উদ্ভিদগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত** করেছিলেন।

৩। মেন্ডেল গবেষণা কাজে যেসব **উপকরণ ব্যবহার** করেছিলেন তা ছিল বংশগতীয় গবেষণা কাজের জন্য অতি উত্তম ও আদর্শ।

৪। মেন্ডেলের নির্বাচিত মটরশুঁটি উদ্ভিদ একটি **স্বনিষিক্ত বর্ষজীবী** এবং প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই এর ফুলে পরাগমুক্তি ঘটায় কোনোরূপ পরপরাগায়িত না হয়ে **স্বনিষেক ঘটে**।

৫। তিনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ একাধারে তাঁর ফলাফল **বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ** করেছিলেন।

৬। তিনি স্বপরাগী ফুল, মটরশুঁটি গাছের বাইরের কোনো বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ না ঘটানোর জন্য পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল।

৭। তিনি **প্রথমে একজোড়া বৈসাদৃশ্য গুণসম্পন্ন লক্ষণ** নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে **দুই জোড়া লক্ষণ** নিয়ে কাজ করেছিলেন।

৮। ধারণা করা হয়, **মেন্ডেলের পূর্বসূরিরা একসাথে অনেকগুলো লক্ষণ নিয়ে গবেষণা করাতে** কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি।

৯। তিনি যে সাত জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছিলেন তার প্রত্যেকটির জন্য দায়ী **উপাদানটি অন্যটির উপর সম্পূর্ণরূপে প্রকট ছিল** এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী উপাদানদ্বয় **ভিন্ন ভিন্ন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে অবস্থিত** ছিল।

১০। মেন্ডেল তাঁর লব্ধ ফলাফলকে দুটি **অর্থপূর্ণ গাণিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন** করেছিলেন। এর পূর্বে কোনো বিজ্ঞানীই সংকরায়ণের ফলাফলের গাণিতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেননি।

১১। মেন্ডেল **অত্যন্ত সতর্কতা ও সততার সাথে পরীক্ষার ফলাফল** রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন।

১২। **গাণিতিক ও পরিসংখ্যানিক ভিত্তিতে** মেন্ডেল তার ফলাফলের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

১১.১ মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলি (Laws of Mendelian Inheritance)

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণের সূত্র (Law of Segregation)

মনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে জননকোষ বা গ্যামিট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

একে জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র (Law of Purity of Gametes) বা **মনোহাইব্রিড ক্রসের** (Law of Monohybrid Cross) **সূত্রও বলা হয়।**

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মেন্ডেল তাঁর সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রেই মটরশুঁটি উদ্ভিদ নির্বাচন করেছিলেন। এ সূত্রটি আরও অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। এখানে মটরশুঁটি উদ্ভিদ দিয়ে সূত্রটি ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথম সূত্র ব্যাখ্যা করার জন্য মেন্ডেল মটরশুঁটি উদ্ভিদের ওপর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। এসব পরীক্ষায় তিনি একসঙ্গে মাত্র এক জোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ করেন। মেন্ডেল এ ধরনের এক পরীক্ষায় একটি **বিশুদ্ধ লম্বা** (TT) মটরশুঁটি গাছের সঙ্গে একটি **বিশুদ্ধ খাটো** (tt)

CamScanner

বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ ঘটান। এখানে উল্লেখ্য যে, লম্বা বৈশিষ্ট্যটি খাটো বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট। বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মটরশুঁটি গাছদ্বয়ের মধ্যে ক্রস বা প্রজনন ঘটানোর ফলে প্রথম অপত্য বংশে বা সংকর পুরুষে (F_1 জনু) যেসব গাছ উৎপন্ন হয়েছিল তার সবক'টিই ছিল **সংকর লম্বা বৈশিষ্ট্যের** (Tt)। F_1 জনুতে উৎপন্ন মটরশুঁটি গাছগুলোর মধ্যে স্বনিষেক ঘটিয়ে তিনি দ্বিতীয় সংকর পুরুষে (F_2 জনু) ৭৫% (৩ ভাগ) লম্বা বৈশিষ্ট্যের এবং ২৫% (১ ভাগ) খাটো বৈশিষ্ট্যের মটরশুঁটি গাছ পান। সুতরাং F_2 জনুর ফিনোটাইপ অনুপাত হয়। ৩ : ১ এবং জিনোটাইপ অনুপাত হয় ১ : ২ : ১ [বিশুদ্ধ লম্বা (TT) ২৫% ঃ সংকর লম্বা (Tt) ৫০% ঃ বিশুদ্ধ খাটো (tt) ২৫%]।

মনে করি, লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিন = T

∴ বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি গাছের জিনোটাইপ = TT

আবার, খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিন = t

∴ বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি গাছের জিনোটাইপ = tt

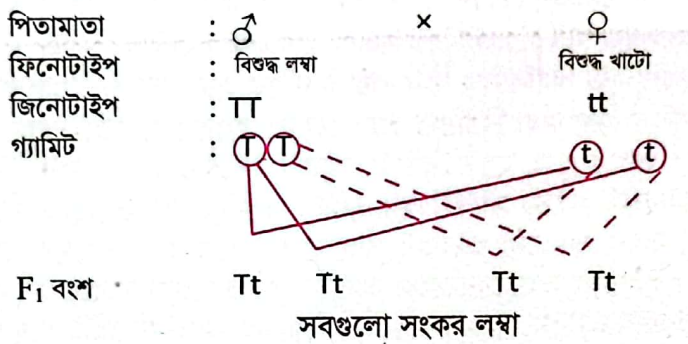

সবগুলো সংকর লম্বা

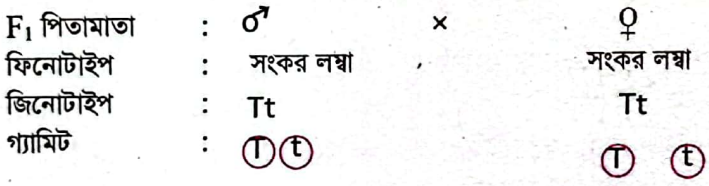

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	T	t
T	TT লম্বা	Tt লম্বা
t	Tt লম্বা	tt খাটো

নিচে ছকে মনোহাইব্রিড ক্রস-এ F_2 বংশধরে উদ্ভিদগুলোর ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত দেখানো হলো–

ফিনোটাইপ	জিনোটাইপ	জিনোটাইপিক অনুপাত	ফিনোটাইপিক অনুপাত
লম্বা	TT Tt	১ ২	৩
খাটো	t t	১	১

মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ৭৫% লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট এবং ২৫% খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ অর্থাৎ লম্বা ও খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ফিনোটাইপিক অনুপাত = ৩ : ১

এবং জিনোটাইপিক অনুপাত = T T : T t : t t = ১ : ২ : ১

F_2 বংশধরের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনটি বৈশিষ্ট্যধারী (লম্বা) গাছের মধ্যে মাত্র একটি বিশুদ্ধ লম্বা (TT), বাকি দুটি সংকর লম্বা (Tt)। যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি F_1 বংশধরে চাপা পড়েছিল F_2 বংশধরে তার (tt) পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে।

CamScanner

পৃথকীকরণের সূত্রের সীমাবদ্ধতা

১। একাধিক জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এ সূত্র সর্বাত্মকরূপে প্রযোজ্য নয়।
২। এপিস্ট্যাটিক জিন ও কমপ্লিমেন্টারি জিনের ক্ষেত্রে এ সূত্র সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়।
৩। একসঙ্গে কার্য সম্পন্নকারী জিনের ক্ষেত্রে এ সূত্র প্রয়োগ করা যায় না।

❑ **কাজ :** প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে প্রথম সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।
তথ্য : গিনিপিগ- কালো বর্ণ = B এবং বাদামি বর্ণ = b এবং কালো বৈশিষ্ট্যটি বাদামি বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment)

দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1 জনু) শুধু প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তী সময় গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়। একে ডাইহাইব্রিড ক্রসের (law of dihybrid cross) **সূত্রও বলা হয়।**

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মেন্ডেল দ্বিতীয় সূত্র ব্যাখ্যা করার জন্য বিশুদ্ধ গোলাকার ও হলুদ বর্ণের বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সঙ্গে কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ করেন।

মটরশুঁটি গাছের বীজের আকার দুটি অ্যালিলিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– গোলাকার (R) এবং কুঞ্চিত (r)। আবার বীজের বর্ণ দুটি অ্যালিলিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– হলুদ (Y) এবং সবুজ (y)। এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাকার বৈশিষ্ট্যটি কুঞ্চিতের ওপরে এবং হলুদ বৈশিষ্ট্য সবুজ বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট। বিশুদ্ধ গোলাকার ও হলুদ বর্ণের (RRYY) বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সাথে বিশুদ্ধ কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের (rryy) বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ ঘটানো হলো। F_1 বংশে সবগুলো মটরশুঁটি গাছ সংকর গোলাকার ও হলুদ বর্ণের (RrYy) বীজবিশিষ্ট হলো। অতঃপর F_1 বংশের অপত্যদের নিজেদের মধ্যে প্রজনন (স্বপরাগায়ন) ঘটালে F_2 বংশে ৯:৩:৩:১ অনুপাতে যথাক্রমে গোলাকার-হলুদ, গোলাকার-সবুজ, কুঞ্চিত-হলুদ এবং কুঞ্চিত-সবুজ মটরশুঁটি গাছ পাওয়া গেল।

মনে করি,

	গোলাকার বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন বা ফ্যাক্টর	=	R
	হলুদ " " " " " "	=	Y
∴	বিশুদ্ধ গোলাকার-হলুদ বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ	=	RRYY
	কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন বা ফ্যাক্টর	=	r
	সবুজ " " " " " "	=	y
∴	বিশুদ্ধ কুঞ্চিত-সবুজ বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ	=	rryy

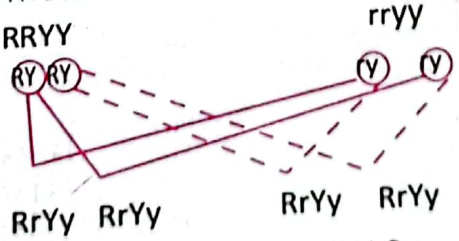

বিশুদ্ধ গোলাকার এবং হলুদ বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত ও সবুজ বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের সংকরায়ণ এবং এর ফলাফল নিচে দেওয়া হলো–

F_1 পিতামাতা	:	♂	×	♀
ফিনোটাইপ	:	সংকর গোলাকার হলুদ		সংকর গোলাকার হলুদ
জিনোটাইপ	:	RrYy		RrYy
গ্যামিট	:	RY Ry rY ry		RY Ry rY ry

CamScanner

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	(RY)	(Ry)	(rY)	(ry)
(RY)	RRYY গোলাকার হলুদ	RRYy গোলাকার হলুদ	RrYY গোলাকার হলুদ	RrYy গোলাকার হলুদ
(Ry)	RRYy গোলাকার হলুদ	RRyy গোলাকার সবুজ	RrYy গোলাকার হলুদ	Rryy গোলাকার সবুজ
(rY)	RrYY গোলাকার হলুদ	RrYy গোলাকার হলুদ	rrYY কুঞ্চিত হলুদ	rrYy কুঞ্চিত হলুদ
(ry)	RrYy গোলাকার হলুদ	Rryy গোলাকার সবুজ	rrYy কুঞ্চিত হলুদ	rryy কুঞ্চিত সবুজ

নিচে ছকে F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত দেখানো হলো–

ফিনোটাইপ	জিনোটাইপ	জিনোটাইপিক অনুপাত	ফিনোটাইপিক অনুপাত
গোলাকার-হলুদ	RRYY RrYY RRYy RrYy	১ ২ ২ ৪	৯
গোলাকার-সবুজ	RRyy Rryy	১ ২	৩
কুঞ্চিত-হলুদ	rrYY rrYy	১ ২	৩
কুঞ্চিত-সবুজ	rryy	১	১

ফিনোটাইপিক অনুপাত = গোলাকার হলুদ : গোলাকার সবুজ : কুঞ্চিত হলুদ : কুঞ্চিত সবুজ =৯ : ৩ : ৩ : ১

এবং জিনোটাইপিক অনুপাত = ১ : ২ : ২ : ৪ : ১ : ২ : ১ : ২ : ১

উপরের পরীক্ষা থেকে মেন্ডেল দেখান যে, দুই জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 বংশে প্রকট বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গোলাকার-হলুদ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং F_2 বংশে গ্যামিটগুলো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার কারণে গোলাকার-হলুদ ও কুঞ্চিত-সবুজ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ছাড়া আরও দুটি নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। নতুন দুই জোড়া বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোলাকার-সবুজ ও কুঞ্চিত-হলুদ।

স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্রের সীমাবদ্ধতা

১। মেন্ডেল-পরবর্তী সময়কালে সাইটোজেনেটিক্স-এর নানাবিধ গবেষণা থেকে জানা যায় যে, স্বাধীন মিলন বা স্বাধীন বণ্টনের সূত্র তখনই প্রযোজ্য হয় যখন ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অ্যালিলগুলো পৃথক পৃথক হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে অবস্থান করে।

২। পৃথক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী অ্যালিলগুলো একই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার পৃথক লোকাসে অবস্থান করলে **লিংকেজের** (linkage; একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো মাতৃজনু থেকে অপত্য জনুতে সঞ্চারিত হওয়ার সময় সেই ক্রোমোজোমে একই সঙ্গে অবস্থান করার প্রবণতা দেখায়, একে লিংকেজ বলে) কারণে অ্যালিলগুলো একত্রে একই গ্যামিটে সঞ্চারণের প্রবণতা দেখায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, **মেন্ডেল নির্বাচিত মটরশুঁটি গাছের সাত জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী অ্যালিলগুলো পৃথক ক্রোমোজোমে অবস্থিত ছিল।**

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র ও দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে পার্থক্য

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র	মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র
১। এটি পৃথকীকরণ সূত্র নামে পরিচিত।	১। এটি স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র নামে পরিচিত।
২। এটি মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	২। এটি ডাই বা পলিহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৩। এক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ ঃ ১।	৩। এক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১।
৪। এক্ষেত্রে শুধু জিনের পৃথকীকরণ হয়।	৪। এক্ষেত্রে জিনের পৃথকীকরণ ছাড়াও জিনের স্বাধীন সঞ্চারণ হয়।
৫। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপত্য বংশে শুধু প্যারেন্টাল টাইপের বংশধর উৎপন্ন হয়।	৫। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপত্য বংশে শুধু প্যারেন্টাল ছাড়াও রিকম্বিনেন্ট টাইপের বংশধর উৎপন্ন হয়।
৬। প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্রকে অনুসরণ করে না।	৬। দ্বিতীয় সূত্র প্রথম সূত্রকে অনুসরণ করে।

কাজ : (i) প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে দ্বিতীয় সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

তথ্য : গিনিপিগ- কালো-খাটো = BS এবং বাদামি-লম্বা বর্ণ = bs এবং কালো-খাটো বৈশিষ্ট্যটি বাদামি-লম্বা বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রকট।

(ii) মেন্ডেলের ১ম সূত্র ও ২য় সূত্রের মধ্যে তুলনা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

CamScanner

সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়

ব্যাক ক্রস (Back cross) : অপত্য বংশীয় (F_1 জনু) কোনো জীবের সঙ্গে জনিতৃ জনুর কোনো জীবের অথবা জনিতৃর সদৃশ জিনোটাইপযুক্ত কোনো জীবের সংকরায়ণের পদ্ধতিকে **ব্যাক ক্রস** (back cross) বলে। সংক্ষেপে, F_1 বংশের জীবের সঙ্গে পিতামাতার যেকোনো বৈশিষ্ট্যের ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলে। পরবর্তী প্রজন্মের ফিনোটাইপ বা তাদের অনুপাত বিশ্লেষণ করেই এই পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়।

অর্থাৎ ব্যাক ক্রস = Tt × TT অথবা Tt × tt (মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে)

টেস্ট ক্রস (Test cross) : কোনো জীবের জিনোটাইপ (হোমোজাইগাস না হেটেরোজাইগাস) নির্ণয়ের জন্য ওই জীবের সঙ্গে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন) জিনোটাইপযুক্ত জীবের যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে **টেস্ট ক্রস** (test cross) বলে। এই ক্রসে অপত্য বংশীয় জীবের সাথে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্নধর্মী পিতৃবংশীয় জীবের ক্রস ঘটানো হয়। টেস্ট ক্রসের ফলে উদ্ভূত পরবর্তী প্রজন্মের বংশধরদের ফিনোটাইপ লক্ষ করে ওই অজানা জিনোটাইপ হিসেব করা হয়।

অর্থাৎ টেস্ট ক্রস = Tt × tt (মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে)

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, **'সকল টেস্ট ক্রসই ব্যাক ক্রস কিন্তু সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়'।**

ব্যাক ক্রস ও টেস্ট ক্রস-এর পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ব্যাক ক্রস	টেস্ট ক্রস
১। সংকরায়ণ	এক্ষেত্রে কোনো জীবের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী কোনো জনুর জীবের ক্রস করা হয়।	এক্ষেত্রে একটি জীবের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন জীবের ক্রস করা হয়।
২। প্রকৃতি	সকল ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রস নয়।	টেস্ট ক্রস মাত্রই ব্যাক ক্রস।
৩। গুরুত্ব	এর মাধ্যমে জীবে আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্য আনা সম্ভব হয়।	এর মাধ্যমে কোনো জীব সংকর কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব।
৪। উদাহরণ	Tt × TT অথবা Tt × tt	Tt × tt

[**বিশেষ তথ্য- ব্যাক ক্রস (Back cross) : উদাহরণ :** মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড বা এক সংকরায়ণ পরীক্ষার ফলে F_1 জনুতে যে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় (Tt) তার ফিনোটাইপ লম্বা হয়। এ ধরনের সংকর উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর যে কোনো উদ্ভিদের (TT অথবা tt) সংকরায়ণ ঘটানোর প্রক্রিয়াকে ব্যাক ক্রস বলা হয়।

(i) F_1 জনুর Tt লম্বা উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর বিশুদ্ধ লম্বা উদ্ভিদের (TT) মিলন ঘটলে কেবল লম্বা উদ্ভিদই জন্মে। তবে এদের মধ্যে TT বিশুদ্ধ লম্বা উদ্ভিদ হয় ৫০% ও Tt সংকর লম্বা উদ্ভিদ হয় ৫০%। এক্ষেত্রে, জিনোটাইপিক অনুপাত = TT : Tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = বিশুদ্ধ লম্বা : সংকর লম্বা = ১ : ১।

জনিতৃ জনু (P) → ♂ বিশুদ্ধ লম্বা × ♀ বিশুদ্ধ খাটো

জিনোটাইপ → TT tt

গ্যামিট → T t

F_1 জনু (প্রথম অপত্য বংশ) → Tt

সংকর লম্বা

ব্যাক ক্রস → Tt (F_1 জনু) × TT (জনিতৃ জনু)

গ্যামিট → T t T T

ফলাফল (অপত্য বংশ) :

♀ \ ♂	T	t
T	TT বিশুদ্ধ লম্বা	Tt সংকর লম্বা
T	TT বিশুদ্ধ লম্বা	Tt সংকর লম্বা

সুতরাং জিনোটাইপিক অনুপাত = TT : Tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = বিশুদ্ধ লম্বা : সংকর লম্বা = ১ : ১

CamScanner

(ii) F_1 জনুর Tt লম্বা উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর বিশুদ্ধ খাটো উদ্ভিদের (tt) সংকরায়ণ ঘটালেও ব্যাক ক্রস সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে, জিনোটাইপিক অনুপাত = Tt : tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = সংকর লম্বা: বিশুদ্ধ খাটো = ১ : ১।

ব্যাক ক্রস ⟶ Tt (F_1 জনু) × tt (জনিতৃ জনু)

গ্যামিট ⟶ (T) (t) (t) (t)

ফলাফল (অপত্য বংশ) :

♀ \ ♂	(T)	(t)
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো

সুতরাং জিনোটাইপিক অনুপাত = Tt : tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = সংকর লম্বা: বিশুদ্ধ খাটো = ১ : ১

প্রয়োগ বা গুরুত্ব : (১) জনিতৃ জনুর (P) আকাঙ্ক্ষিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে সংকর উদ্ভিদে আনার জন্য ব্যাক ক্রস করা হয়। (২) সংকরায়ণ পদ্ধতিতে বারবার ব্যাক ক্রস করে আকাঙ্ক্ষিত জিনকে সংকর উদ্ভিদে সঞ্চারিত করা যায়। এইভাবে বিশুদ্ধ জীব সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

টেস্ট ক্রস (Test cross) : মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড বা এক সংকরায়ণ পরীক্ষার ফলে F_1 জনুতে যে সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় (Tt) তার ফিনোটাইপ লম্বা হয়। এ ধরনের সংকর উদ্ভিদের সঙ্গে জনিতৃ জনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন-tt) জিনোটাইপযুক্ত জীবের যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে **টেস্ট ক্রস** (test cross) বলা হয়।

উদাহরণ : মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড বা এক সংকরায়ণ পরীক্ষায় একটি লম্বা (TT অথবা Tt) গাছের জিনোটাইপ নির্ণয়ের জন্য তাকে একটি বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন খাটো গাছের (tt) সঙ্গে ক্রস করতে হয়। মিলনে উৎপন্ন সব অপত্য গাছই যদি সংকর লম্বা হয়, তাহলে জনিতৃ গাছটি বিশুদ্ধ লম্বা (TT) ছিল (TT × tt = Tt)। অপরপক্ষে, যদি অপত্য গাছগুলো ৫০% লম্বা এবং ৫০% খাটো জন্মায় তাহলে জনিতৃ গাছটি সংকর লম্বা (Tt) ছিল (Tt × tt = Tt : tt)। নিম্নে মেন্ডেলের এক সংকর টেস্ট ক্রসের পরীক্ষা বর্ণনা করা হলো :

F_1 জনুতে প্রাপ্ত সংকর লম্বা (Tt) মটরশুঁটি গাছের টেস্ট ক্রস ঘটালে F_2 বংশে অর্ধেক সংকর লম্বা (Tt) এবং অর্ধেক বিশুদ্ধ খাটো (tt) গাছ জন্মাবে। অর্থাৎ F_2 জনুতে সৃষ্ট অপত্যদের জিনোটাইপিক ও ফিনোটাইপিক উভয়েরই অনুপাত ১ : ১ হবে।

টেস্ট ক্রস ⟶ Tt (F_1 জনু) × tt (জনিতৃ জনু)

গ্যামিট ⟶ (T) (t) (t) (t)

ফলাফল (অপত্য বংশ) :

♀ \ ♂	(T)	(t)
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো
(t)	Tt সংকর লম্বা	tt বিশুদ্ধ খাটো

সুতরাং জিনোটাইপিক অনুপাত = Tt : tt = ১ : ১ ও ফিনোটাইপিক অনুপাত = সংকর লম্বা: বিশুদ্ধ খাটো = ১ : ১

প্রয়োগ বা গুরুত্ব : (১) টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে কোনো জীবের জিনোটাইপ নির্ধারণ করা যায়। (২) টেস্ট ক্রস দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, F_2 জনুতে প্রচ্ছন্ন গুণের পুনরাবির্ভাবের জন্য দায়ী F_1 জনুর জীবের হেটেরোজাইগাস অবস্থা। (৩) টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে জানা যায় যে, কোনো একজোড়া বৈশিষ্ট্য পরস্পরের অ্যালিল কিনা। (৪) টেস্ট ক্রসের যে জীবের ফিনোটাইপ নির্ধারণ করতে হবে তার সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন জনিতৃর ব্যাক ক্রস করা হয়। (৫) মূলত টেস্ট ক্রসের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় যে, কোনো জীব সংকর, না বিশুদ্ধ।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মেন্ডেলের ডাইহাইব্রিড বা দ্বি-সংকরায়ণ টেস্ট ক্রসে অর্থাৎ F_1 জনুতে প্রাপ্ত সংকর গোলাকার-হলুদ (RrYy) মটরশুঁটি গাছের সাথে জনিতৃ জনুর হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন (rryy) মটরশুঁটি গাছের ক্রস ঘটালে F_2 জনুতে প্রাপ্ত অপত্যের ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক উভয়ের অনুপাতই ১ : ১ : ১ : ১ হয়।]

CamScanner

১১.২ বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব (Chromosomal Theory of Inheritance)

W.S.Sutton (1877-1916) T.Boveri (1862-1915)

মেন্ডেলবাদ পুনরাবিষ্কারের (1900 খ্রিঃ) পরবর্তী সময়কালে **Winiwarter, Montogomery** প্রমুখ বিজ্ঞানীর এবং তাঁদের নিজেদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে **সাটন** (W. S. Sutton) ও **বোভারি** (T. Boveri) 1902 খ্রিষ্টাব্দে পৃথকভাবে ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টরের (জিন) সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। এ সাদৃশ্যর ভিত্তিতে বংশগতি বিষয়ে সাটন ও বোভারি প্রবর্তিত তত্ত্বই হলো বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব বা **ইনহেরিট্যান্স-এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব** (chromosomal theory of inheritance)। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো– মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টর বা জিনগুলো ক্রোমোজোমে অবস্থান করে এবং মিয়োসিস কোষ বিভাজন কালে ক্রোমোজোমের (একই সঙ্গে জিনের) পৃথকীকরণ ও স্বাধীন বণ্টন ঘটে অর্থাৎ মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রসমূহ ক্রোমোজোম ও একই সঙ্গে জিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্রোমোজোমগুলোই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক বা জিনের বাহক। মেন্ডেলের জিনগুলো ক্রোমোজোমের ওপর বসিয়ে এদের সঞ্চারণরীতি ব্যাখ্যা করা যায়। মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ও ডাইহাইব্রিড সংকরায়ণ পরীক্ষার উপাদানগুলো যথাক্রমে এক জোড়া এবং দু'জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের ওপর বসিয়ে এদের পৃথকীকরণ এবং স্বাধীন বিন্যাস বা মিলনের রূপরেখা পাওয়া যায়।

সাটন ও বোভারি প্রবর্তিত ইনহেরিট্যান্স-এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব বা বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের মূল ভিত্তিগুলো (অর্থাৎ জিন ও ক্রোমোজোমের সাদৃশ্য বা সমান্তরাল) নিম্নরূপ :

- ক্রোমোজোমের আচরণের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদান বা জিনের আচরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।
- মেন্ডেলের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো অর্থাৎ জিনগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে। প্রতিটি উপাদান জোড়া জননকোষ (gamete) উৎপন্ন হওয়ার সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।
- জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার সময় প্রতি জোড়া উপাদানের একটি পুং জননকোষ (শুক্রাণু) হতে এবং অপরটি স্ত্রী জননকোষ (ডিম্বাণু) হতে এসে পুনরায় মিলিত হয়।
- মিয়োসিস ও নিষিক্তকরণ ঘটনায় দেখা যায় যে, ক্রোমোজোমগুলোও জোড়ায় জোড়ায় থাকে, অর্থাৎ কয়েক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম (homologous chromosome) থাকে। প্রতি জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম জননকোষ উৎপন্ন হওয়ার সময় মিয়োসিস বিভাজনের ফলে পরস্পর পৃথক হয়ে যায়।
- নিষিক্তকরণের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার সময় প্রতি জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একটি পুং জননকোষ মারফত এবং অপরটি স্ত্রী জননকোষ হতে এসে পুনরায় মিলিত হয়।
- মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, কোনো এক জোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক উপাদানের পৃথকীকরণ ও মিলন অন্য জোড়া উপাদানের ওপর নির্ভরশীল নয়।
- মিয়োসিস এবং নিষিক্তকরণের সময়ও দেখা যায়, কোনো এক জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ এবং মিলন অন্য কোনো জোড়া ক্রোমোজোমের আচরণ এবং জিনের আচরণ সমান।

CamScanner

- সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণ ও মিলনের সাথে জিনের পৃথকীকরণ ও মিলনের অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে।

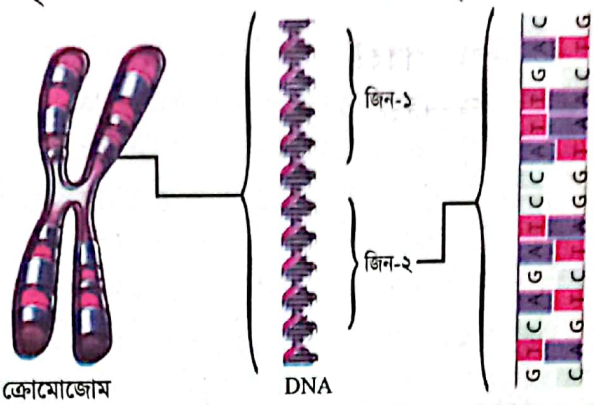

চিত্র ১১.১ : ক্রোমোজোম, DNA ও জিনের মধ্যে সম্পর্ক

বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের বা উত্তরাধিকারের ক্রোমোজোম তত্ত্বের প্রধান যুক্তিসমূহ

- মিয়োসিসের অ্যানাফেজ দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমদ্বয়ের পৃথকীকরণ এবং গ্যামিট সৃষ্টিকালে মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টর (জিন) বা অ্যালিলদ্বয়ের পৃথকীকরণ যথেষ্ট সাদৃশ্য যুক্ত।
- মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টরের ন্যায় ক্রোমোজোমও জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে।
- অ্যানাফেজ দশায় সমসংস্থ ক্রোমোজোমের পৃথকীকরণকালে একটি ক্রোমোজোমের সাথে অন্যান্য প্রতিটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়গুলোর মধ্যে যে কোনো ক্রোমোজোমে সঞ্চারিত হতে পারে। অর্থাৎ 2^n সংখ্যক ক্রোমোজোম বিন্যাস ঘটতে পারে। যেমন : সি আরচিনের $n = 18$, সুতরাং এ ক্ষেত্রে $2^{18} = 262,144$টি ক্রোমোজোম বিন্যাস সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং মেন্ডেলীয় ফ্যাক্টরের (জিন) স্বাধীন বণ্টনের সাথে ক্রোমোজোমের স্বাধীন বণ্টনের সাদৃশ্য বা সমান্তরলতা বিদ্যমান।
- দুটি গ্যামিটের মিলনের ফলে অ্যালিলদ্বয় যেভাবে জোড়বদ্ধ হয়, ঠিক একইভাবে ক্রোমোজোমদ্বয়ের সংযুক্তির মাধ্যমে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট সৃষ্টি হয়।

১১.৩ মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম (Modification or Deviations of Mendel's Laws)

১৯০০ সালে মেন্ডেলের সূত্র পুনরাবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পর হতেই বিভিন্ন বংশগতিক পরীক্ষায় মেন্ডেলীয় অনুপাতের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(ক) আপাত ব্যতিক্রম (Apparent Exceptions) : মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের যেসব ব্যতিক্রম কিছু শর্ত সাপেক্ষে মেন্ডেলবাদের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যায়, সেগুলোকে আপাত ব্যতিক্রম বলে। যেমন– অসম্পূর্ণ প্রকটতা, সমপ্রকটতা, লিথাল জিন, এপিস্ট্যাসিস ইত্যাদি কারণে ব্যতিক্রম। এগুলোকে মেন্ডেলবাদের রূপান্তরও (modification) বলা যায়।

(খ) প্রকৃত ব্যতিক্রম (Real Exceptions) : মেন্ডেলিয়ান অনুপাতের যেসব ব্যতিক্রম মেন্ডেলবাদের ভিত্তিতে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলোকে প্রকৃত ব্যতিক্রম বলে। যেমন– লিংকেজ, মাল্টিপল অ্যালিল, পলিজিন, প্লিওট্রপি ইত্যাদি কারণে ব্যতিক্রম।

মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বংশগতি সম্পর্কিত ১ম সূত্র ও ২য় সূত্র উপস্থাপন করেন। এতে জীবের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যে সকল মতামত প্রকাশ করা যায় তা নিম্নরূপ–

১। একজোড়া জিন এক লোকাস থেকে কেবল একটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।
২। প্রকট জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায় তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।
৩। প্রচ্ছন্ন জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম।
৪। সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জিনগুলো সম্মিলিতভাবে মাঝামাঝি কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করে পাশাপাশি অবস্থান করে।
৫। ক্রোমোজোমের এক লোকাসের জিন অন্য লোকাসের জিনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।
৬। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টির সময় প্রতিটি জিন স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু মেন্ডেল পরবর্তী বিভিন্ন বংশগতীয় পরীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র প্রকৃত মেন্ডেলবাদের (১ম সূত্র ও ২য় সূত্র) ভিত্তিতে সর্বপ্রকারের উত্তরাধিকার এবং বংশগতি সংক্রান্ত জটিলতা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সব ধরনের জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষায় মেন্ডেলিয়ান অনুপাত ৩ : ১ এবং ৯ : ৩ : ৩ : ১ পাওয়া না, এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের বংশগতীয় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলোকে নন-মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স (Non-mendelian inheritance) বা ব্লেন্ডিং ইনহেরিটেন্স (blending inheritance) বলা হয়।

CamScanner

মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম

১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance)– ফলাফল ১ : ২ : ১

একটি বৈশিষ্ট্য যদি আরেকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্পূর্ণ প্রকট না হয়, তাহলে সংকর জীবে উভয়ের মাঝামাঝি একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, এ ধরনের ঘটনাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা ইনকমপ্লিট ডমিন্সে বলে। কার্ল করেন্স (Carl Correns, 1903) এটি আবিষ্কার করেন। অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে সেকেন্ডারি জিন (intermediate gene) বলে। ইহা মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম। অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের F_2 বংশের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১ : ২ : ১ হয়। সন্ধ্যামালতী, তুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : লাল ফুলবিশিষ্ট ও সাদা ফুলবিশিষ্ট সন্ধ্যামালতী (four O' clock flower, *Mirabilis jalapa*) উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 বংশের সব উদ্ভিদ লাল বা সাদা ফুলবিশিষ্ট না হয়ে গোলাপি (pink) বর্ণের ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে লাল বা সাদা কোনো রংই সম্পূর্ণ প্রকট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে না। F_2 বংশে ১ : ২ : ১ অনুপাতে যথাক্রমে লাল, গোলাপি এবং সাদা ফুলবিশিষ্ট উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

মনে করি,

সন্ধ্যামালতীর লাল রঙের জন্য দায়ী জিন = R
" " " " " জিনোটাইপ = RR

আবার,

সন্ধ্যামালতীর সাদা রঙের জন্য দায়ী জিন = r
∴ " " " " " জিনোটাইপ = rr

সন্ধ্যামালতি

পিতামাতা	: ♂	×	♀	
ফিনোটাইপ	: লাল ফুল		সাদা ফুল	
জিনোটাইপ	: RR		rr	
গ্যামিট	: (R) (R)		(r) (r)	
F_1 বিংশ	Rr	Rr	Rr	Rr

সবগুলো গোলাপি ফুল

F_1 পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: গোলাপি ফুল		গোলাপি ফুল
জিনোটাইপ	: Rr		Rr
গ্যামিট	: (R) (r)		(R) (r)

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	(R)	(r)
(R)	RR লাল	Rr গোলাপি
(r)	Rr গোলাপি	rr সাদা

F_2 বংশে ফিনোটাইপিক অনুপাত = লাল (RR) : গোলাপি (Rr) : সাদা (rr) = ১ : ২ : ১

অর্থাৎ মনোহাইব্রিড ক্রসের জিনোটাইপিক অনুপাতের সমান।

ব্যাখ্যা : এখানে লাল ফুলের জন্য RR এবং সাদা ফুলের জন্য rr জিন দেখানো হয়েছে। R-এর সম্পূর্ণ প্রকটতা থাকলে F_1-উদ্ভিদের ফুল লাল রং-এর হতো এবং F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক অনুপাত হতো ৩ : ১। কিন্তু R-এর অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণেই F_1 হেটারোজাইগাস (Rr)-এর বর্ণ গোলাপি বা পিংক এবং F_2 বংশধরে ১ : ২ : ১ ফিনোটাইপিক অনুপাতের (লাল, গোলাপি, সাদা) সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সন্ধ্যামালতী উদ্ভিদের ফুলের রঙের বংশগতির ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায়।

CamScanner

২. সমপ্রকটতা (Co-dominance)– ফলাফল ১ : ২ : ১

পরস্পর বিপরীতধর্মী গুণাবলি নির্ধারক জিনের মধ্যে যেমন অসম্পূর্ণ প্রকটতা দেখা যায় তেমনি দুই অ্যালিলের মধ্যে অপর একটি সম্পর্ক হলো **সমপ্রকটতা** (co-dominance)। **হেটারোজাইগাস অবস্থায় কোনো অ্যালিল প্রকট না হওয়ার কারণে দুই বা ততোধিক অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা বা প্রচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে না। এ অবস্থায় উভয় অ্যালিলে নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য সংকর জীবে (F_1) সমভাবে প্রকাশিত হয়, এ ধরনের ঘটনাকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে। অথবা সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী প্রকট জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে।** এতে মেন্ডেলিয়ান ৩ : ১ অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে ১ : ২ : ১ রূপে প্রকাশ পায়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর রং, **আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগির পালকের রং, মানুষের রক্ত গ্রুপের অ্যালিল,** মসুর ডাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমপ্রকটতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গায়ের রং-এর বংশগতি ব্যাখ্যা করা হলো– খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গায়ের বর্ণ **লাল, সাদা ও রোয়ান** (roan) হয়ে থাকে। প্রতিটি লোম রোয়ান নয়, কিছু লোম সাদা এবং কিছু লোম লাল। এই **লাল** এবং **সাদা** রঙের লোমের মিশ্রণে রোয়ান রঙের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লাল ও সাদা বর্ণ নির্ধারক অ্যালিলদ্বয় সমপ্রকট বা **কোডমিন্যান্ট** (codominant) হওয়ার কারণে এদের সংকরায়ণে F_1 বংশের সকল গরু রোয়ান বর্ণ হয় এবং F_2 বংশে ১ : ২ : ১ অনুপাতে লাল, রোয়ান ও সাদা রঙের হয়।

মনে করি, লাল লোমের জন্য নির্ধারক জিন = C^R

∴ " " " " জিনোটাইপ = $C^R C^R$

আবার, সাদা লোমের জন্য নির্ধারক জিন = C^W

" " " " জিনোটাইপ = $C^W C^W$

রোয়ান গরু

পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : লাল সাদা
জিনোটাইপ : $C^R C^R$ $C^W C^W$
গ্যামিট : C^R C^R C^W C^W

F_1 বংশ : $C^R C^W$ $C^R C^W$ $C^R C^W$ $C^R C^W$

সবগুলো রোয়ান

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : রোয়ান রোয়ান
জিনোটাইপ : $C^R C^W$ $C^R C^W$
গ্যামিট : C^R C^W C^R C^W

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	C^R	C^W
C^R	$C^R C^R$ লাল	$C^R C^W$ রোয়ান
C^W	$C^R C^W$ রোয়ান	$C^W C^W$ সাদা

F_2 বংশে ফিনোটাইপিক অনুপাত : লাল ($C^R C^R$) : রোয়ান ($C^R C^W$) : সাদা ($C^W C^W$) = ১ : ২ : ১

অর্থাৎ মনোহাইব্রিড ক্রসের জিনোটাইপিক অনুপাতের সমান।

সুতরাং খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গায়ের বর্ণের ক্ষেত্রে সমপ্রকটতা দেখা যায়।

❑ **কাজ :** প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে সমপ্রকটতার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লিখে শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর।

তথ্য : আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগি: কালো পালক = BB এবং সাদা পালক = WW এবং কালো ও সাদা বৈশিষ্ট্যদ্বয় পরস্পরের ওপর সমপ্রকট। F_1 জনু (BW): কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত মোরগ-মুরগি (নীল)। F_2 জনু ব্যাখ্যা কর।

CamScanner

অসম্পূর্ণ প্রকটতা ও সমপ্রকটতার মধ্যে পার্থক্য

অসম্পূর্ণ প্রকটতা (incomplete dominance)	সমপ্রকটতা (co-dominance)
১। এক্ষেত্রে প্রকট অ্যালিলটি আংশিক প্রকটতা দেখায়।	১। এক্ষেত্রে উভয় অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা দেখায়।
২। F_1 বংশে বা হেটারোজাইগাস জীবে উভয় খাঁটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনোটিরই প্রকাশ ঘটে না। অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তী ফিনোটাইপ পরিলক্ষিত হয়।	২। F_1 বংশে বা হেটারোজাইগাস জীবে একই সাথে উভয় খাঁটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।
৩। কোনো অ্যালিলই স্বাধীন ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটায় না।	৩। উভয় অ্যালিলই স্বাধীন ও সর্বাত্মক প্রভাব ঘটায়।
৪। হোমোজাইগাস অবস্থায় আলাদা বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পায়।	৪। হোমোজাইগাস অবস্থায় দুটি বৈশিষ্ট্যের যে কোনো একটি প্রকাশ পায়।

৩. লিথাল জিন বা ঘাতক জিন বা মারণ জিন (Lethal Gene)– ফলাফল ২ : ১

যেসব জিন কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিথাল জিন বলে। এটি জীবের জিন বা DNA এর কোনো অংশের **মিউটেশনের** (mutation; বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তন) কারণে ঘটে থাকে। একে **লিথাল মিউটেশন** (lethal mutation) বলে। মিউটেশনের ফলে যদি কোনো জীবের জীবন ধারণের জন্য তার দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন (এনজাইম) নিষ্ক্রিয় হয়, তাহলে জীব মারা যায়। মানুষসহ বিভিন্ন জীবদেহে এক বা একাধিক লিথাল জিন থাকতে পারে।

লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য

- লিথাল জিন এক প্রকার **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene) যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।
- প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থাতেই জীবের মৃত্যু ঘটাতে পারে কিংবা জীবের আঙ্গিক বৈকল্য ঘটাতে পারে।
- প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- জীব জাইগোট বা ভ্রূণ অবস্থায় মারা যায় বলে লিথাল জিনের প্রভাব চোখে পড়ে না, তবে কোনো ক্ষেত্রে জীবের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রকাশ ঘটে।
- লিথাল জিনের প্রভাবে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের F_2 বংশের **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ : ১ হয়।**

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : ফরাসি জিনতত্ত্ববিদ **লুসিয়েন ক্যুয়েনো** (Lucien Cuénot, 1905) সর্বপ্রথম ইঁদুরের মধ্যে এ মারণ জিনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। ইঁদুরের **হলুদ** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী জিন (Y) যখন হোমোজাইগাস অবস্থায় (YY) থাকে ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়।

দুটি হলুদাভ (yellowish) রঙের ইঁদুরের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে ২ : ১ অনুপাতে হলুদাভ এবং হলুদবিহীন (non-yellowish) রঙের ইঁদুর পাওয়া যায়। অন্যান্য গবেষকের গবেষণায় দেখা যায় যে, হলুদাভ দুটি ইঁদুরের সংকরায়ণে প্রাপ্ত শাবক সংখ্যার তুলনায় প্রায় $\frac{১}{৪}$ অংশ (২৫%) কম। এসব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, হলুদ রঙের জন্য দায়ী জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে সে জাইগোট বেঁচে থাকতে পারে না, জন্মের পূর্বেই ভ্রূণীয় অবস্থায় মারা যায়। হলুদাভ স্ত্রী ইঁদুরের গর্ভে মৃত ভ্রূণ পাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে করি,

হলুদাভ রঙের জন্য দায়ী জিন = Y (লিথাল জিন, হোমোজাইগাস অবস্থায় ভ্রূণের মৃত্যু ঘটায়)

হলুদবিহীন (বা মেটে বা অ্যাগাউটি) রঙের জন্য দায়ী জিন = y

∴ হলুদাভ রঙের জন্য দায়ী জিনোটাইপ = Yy

পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: হলুদাভ ইঁদুর		হলুদাভ ইঁদুর
জিনোটাইপ	: Yy		Yy
গ্যামিট	: (Y) (y)		(Y) (y)

CamScanner

ফলাফল চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	Ⓨ	ⓨ
Ⓨ	YY মৃত	Yy হলুদাভ
ⓨ	Yy হলুদাভ	yy হলুদবিহীন

ফিনোটাইপিক অনুপাত = হলুদাভ : হলুদবিহীন = ২ : ১

কুঁয়েনোর উল্লেখিত বিশ্লেষণে জানা যায় যে, হোমোজাইগাস প্রকট জিনোটাইপধারী (YY) শাবকগুলো ভ্রূণাবস্থায় মারা যায়। ফলে অপত্য বংশে হলুদাভ ও হলুদবিহীন ইঁদুরের অনুপাত ৩ : ১ না হয়ে ২ : ১ হয়।

লিথাল জিনের প্রভাব

লিথাল জিনের প্রভাবে ক্রিপার (Creeper) মুরগি, পা-বিহীন (Amputed) বাছুর এবং মানুষে ব্র্যাকিফ্যালাঞ্জি (Brachyphalangy), হিমোফিলিয়া (Haemophilia), জন্মগত ইকথিওসিস (Congenital Ichthyosis), ইনফ্যান্টাইল অ্যামারটিক ইডিওসি (Infantile Amaurotic Idiocy) এবং থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) হতে দেখা যায়।

প্রকৃতিতে এমন কিছু লিথাল জিনও রয়েছে যাদের প্রভাবে বাহক জীব ছোট অবস্থায় মারা যায় না বরং বাহক বড় হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে এরা বংশবৃদ্ধিও ঘটাতে পারে। এছাড়াও সেমিলিথাল জিন (semilethal gene; ৫০% এর বেশি জীব মারা যায়) ও সাবভাইটাল জিন (subvital gene; ৫০% এর কম জীব মারা যায়) নামক দু'ধরনের লিথাল জিন পাওয়া যায়। মানুষের **হিমোফিলিয়া** হয় সেমিলিথাল জিনের কারণে ও **ড্রসোফিলা** মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টি হয়, সাবভাইটাল জিনের কারণে।

❑ **কাজ :** (i) লাল ফুল এবং সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 জনুতে লাল বা সাদা ফুল পাওয়া যায় না কেন– ব্যাখ্যা কর।/লাল ফুল এবং সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 জনুতে সব ফুল লাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। (ii) লাল ফুল এবং সাদা ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_2 জনুতে কী ঘটবে চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। (iii) সাদা ও লাল ফুলের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 এর গোলাপি ফুলের সাথে মাতৃবংশের একটি লাল ফুলের ক্রসে কী ঘটবে? জিনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কর। (iv) কালো বর্ণের এবং সাদা বর্ণের প্রাণীর মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে F_1 জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা কর। (v) সাদা ছোপযুক্ত দুটি প্রাণীর মধ্যে ক্রসের ফলাফলের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও। (vi) ১ : ২ : ১ ব্যাখ্যা করে মেন্ডেলের সূত্রের সাথে এর সম্পর্কের বিষয়ে মতামত দাও। (vii) ১:২:১ মোতাবেক F_1 জনু বিশ্লেষণ কর। (viii) লিথাল জিন না থাকলে কালো ও সাদা ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটানোর পর F_2 জনুর ফলাফল কী হবে– ব্যাখ্যা কর। (ix) লিথাল জিনযুক্ত কালো ও সাদা ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_2 জনুর অনুপাত ব্যাখ্যা কর। (x) কখনও কখনও অপত্য বংশধরের মৃত্যুর কারণে ৩:১ অনুপাতের পরিবর্তন হয়– উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম

১. পরিপূরক জিন (Complementary Gene)– ফলাফল ৯ : ৭

একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যখন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন সমান কার্যকর ভূমিকা পালন করে তখন জিন দুটিকে একে অপরের পরিপূরক জিন বলে। এক্ষেত্রে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর পরিবর্তে ৯ : ৭ হয়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মিষ্টি মটরশুঁটি উদ্ভিদে (*Lathyrus odoratus*) সাদা ফুলবিশিষ্ট দুটি আলাদা **স্ট্রেইন** (strain) পাওয়া যায়। উক্ত স্ট্রেইন দুটির মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশধরের (F_1) সব উদ্ভিদের ফুল **বেগুনি** (violet) হয়। কিন্তু F_2 বংশধরে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত ৯ : ৭ হয়। 1904 সালে **বেটসন** এবং **পানেট** (Bateson & Punnett) এ পরীক্ষা করেন। মূলত মটরশুঁটির বেগুনি রঙের জন্য হলো **অ্যান্থোসায়ানিন** (anthocyanin) নামক রাসায়নিক পদার্থ।

CamScanner

মনে করি, সাদা ফুলবিশিষ্ট স্ট্রেইন দুটির জিনোটাইপ যথাক্রমে AAbb ও aaBB.

পিতামাতা : ♂ × × ♀
ফিনোটাইপ : সাদা ফুলবিশিষ্ট মটরশুঁটি সাদা ফুল বিশিষ্ট মটরশুঁটি
জিনোটাইপ : AAbb aaBB
গ্যামিট : (Ab) (Ab) (aB) (aB)

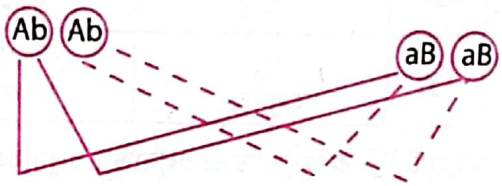

F1 বংশ : AaBb AaBb AaBb AaBb
সবগুলো বেগুনি ফুলবিশিষ্ট মটরশুঁটি

F1 পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : বেগুনি ফুল বেগুনি ফুল
জিনোটাইপ : AaBb AaBb
গ্যামিট : (AB) (Ab) (aB) (ab) (AB) (Ab) (aB) (ab)

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	(AB)	(Ab)	(aB)	(ab)
(AB)	AABB বেগুনি ফুল	AABb বেগুনি ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল
(Ab)	AABb বেগুনি ফুল	AAbb সাদা ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল
(aB)	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	aaBB সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল
(ab)	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল	aabb সাদা ফুল

F_2 বংশের ফিনোটাইপিক অনুপাত = বেগুনি ফুল : সাদা ফুল = ৯ : ৭

উপরের চেকার বোর্ডে দেখা যায়, যেসব জিনোটাইপে A ও B একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপ বেগুনি হয়েছে এবং যেসব জিনোটাইপে A অথবা B জিনের যেকোনো একটি আছে বা দুটির একটিও নেই সেসব ক্ষেত্রে সাদা হয়েছে।

২. এপিস্ট্যাসিস (Epistasis)

একটি জিনের বাহ্যিক প্রকাশ অপর আরেকটি নন-অ্যালিলিক (non-allelic) **জিন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে এ ধরনের ঘটনাকে এপিস্ট্যাসিস** (epistasis) **বা নিরোধন বলে।** যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দান করে তাকে **বাধক জিন বা এপিস্ট্যাটিক জিন** (epistatic gene) এবং যে জিন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** (hypostatic gene) বলে।

(ক) প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant epistasis)– ফলাফল ১৩ : ৩

যে প্রক্রিয়ায় একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন তাকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

সাদা **লেগহর্ন** (Leghorns) গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগির পালকের সাদা রং অন্যান্য রঙের ওপর প্রকট। লেগহর্ন ছাড়াও **ওয়াইন ডটস** (Wyandotte), **প্লাইমাউথ রক্স** (Plymouth rocks) ইত্যাদির অন্যান্য গোষ্ঠীতে সাদা রঙের পালক দেখা গেলেও সেখানে এ রং প্রচ্ছন্ন। এসব মোরগ-মুরগিতে সাদা রঙের জন্য দায়ী জিন লেগহর্নের সাদা জিনের

তুলনায় পৃথক ধরনের। পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, সাদা লেগহর্ন জাতের মোরগ-মুরগি আসলে রঙিন পালকের জিন বহন করে। কিন্তু এ জিনের সাথে অন্য একটি জিনের সংযুক্তি থাকায় সেটি পালকের রঙের প্রকাশকে দমিয়ে রাখে। ফলে সাদা লেগহর্ন মূলত রঙিন মোরগ-মুরগি হওয়া সত্ত্বেও আসল রং প্রকাশে ব্যর্থ হওয়ায় এদের বাহ্যিক রূপ সাদা হয়। এক্ষেত্রে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১৩ : ৩ হয়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : সাদা লেগহর্ন ও সাদা ওয়াইন ডটসের মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে বিস্ময়কর ফলাফল লক্ষ করা গেছে। একটি সাদা পালকযুক্ত লেগহর্নের সাথে সাদা পালকযুক্ত ওয়াইন ডটসের ক্রস ঘটালে প্রথম অপত্য বংশে সবগুলো সাদা পালকযুক্ত হয়। F_1 বংশের মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা গেছে F_2 বংশে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের মোরগ-মুরগিরই আবির্ভাব ঘটে এবং এদের অনুপাত হয় ১৩ : ৩। 1908 সালে বেটসন এবং পানেট (Bateson & Punnett) এ পরীক্ষা করেন।

মনে করি,

সাদা লেগহর্নের রঙিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট হাইপোস্ট্যাটিক জিন = C

" " " " বাধাদানকারী প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন = I

সুতরাং সাদা লেগহর্নের জিনোটাইপ = IICC

এবং " ওয়াইন ডটসের " = iicc

পিতামাতা ঃ ♂ × ♀

ফিনোটাইপ ঃ সাদা লেগহর্ন — সাদা ওয়াইন ডট্স

জিনোটাইপ ঃ IICC — iicc

গ্যামিট ঃ IC IC — ic ic

F_1 বংশ : IiCc IiCc IiCc IiCc

সবগুলো সাদা

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀

ফিনোটাইপ : সাদা — সাদা

জিনোটাইপ : IiCc — IiCc

গ্যামিট : IC Ic iC ic — IC Ic iC ic

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	IC	Ic	iC	ic
IC	IICC সাদা	IICc সাদা	IiCC সাদা	IiCc সাদা
Ic	IICc সাদা	IIcc সাদা	IiCc সাদা	Iicc সাদা
iC	IiCC সাদা	IiCc সাদা	iiCC রঙিন	iiCc রঙিন
ic	IiCc সাদা	Iicc সাদা	iiCc রঙিন	iicc সাদা

F_2 বংশের ফিনোটাইপিক অনুপাত = সাদা : রঙিন = ১৩ : ৩

চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিন I এর উপস্থিতি C জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সবসময় বাধাদান করে। কেবল I এর অনুপস্থিতিতেই C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে।

❑ কাজ : (i) সাদা লেগহর্ন এবং সাদা ওয়াইন ডটসের মধ্যে ক্রস ঘটালে কী ঘটবে তার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা চেকার বোর্ডে দেখাও।/সাদা লেগহর্ন এবং সাদা ওয়াইন ডটসের মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 ও F_2 জনুর ফলাফল প্লানেটের চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও।/১৩:৩ অনুপাতটি ব্যাখ্যা কর। (ii) এপিস্ট্যাটিসের সাথে বংশগতির কোনো সম্পর্ক আছে কি? ব্যাখ্যা কর।

(খ) দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Duplicate Recessive Epistasis) - ফলাফল ৯ : ৭

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন জিন একে অপরের প্রকট অ্যালিলকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করলে তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। মানুষের জন্মগত **মূক-বধিরতা** দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের একটি অন্যতম উদাহরণ। দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের কারণে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের F_2 জনুতে **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ : ৭ অনুপাতে প্রকাশ পায়।**

দুইটি ভিন্ন ভিন্ন এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে মানুষ জন্মগত মূক-বধির (deaf-mute) হয় এবং এ দুটি এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এমনভাবে ইন্টারঅ্যাকশন ঘটায় যে, একটির হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থা অপরটির প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ উক্ত দুই জোড়া প্রচ্ছন্ন জিনের যেকোনো এক জোড়া থাকলে (অন্য জোড়ার প্রকট জিন থাকলেও) কোনো ব্যক্তি জন্মকালে বধির হবে এবং এই বধিরতার কারণে সে মূকও হবে। কোনো হেটারোজাইগাস ব্যক্তি এ দুটি এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন বহন করলে সে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি লাভ করে। কিন্তু দু'জন স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হেটারোজাইগাস পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যথাক্রমে ৯ : ৭ অনুপাতে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূক-বধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মনে করি, a ও b দুটি এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব, সূত্রানুযায়ী aaBB জিনোটাইপ সম্পন্ন ব্যক্তি মূক-বধির হবে। কারণ এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন a স্বাভাবিক শ্রবণের জন্য দায়ী প্রকট B জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে।

অনুরূপভাবে, AAbb জিনোটাইপ সম্পন্ন ব্যক্তি ও মূক-বধির হবে। কেননা এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন b স্বাভাবিক শ্রবণের জন্য দায়ী প্রকট A জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে। উল্লিখিত দুটি জিনোটাইপের দু'জন মূক-বধির পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সকল সন্তান-সন্ততি স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে। কারণ বধিরতার জন্য দুটি জিনই প্রচ্ছন্ন।

সভ্য মানব সমাজে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ সম্পর্ক প্রচলিত না থাকায় দু'জন হেটারোজাইগাস পুরুষ ও মহিলার বিবাহঘটিত সন্তান-সন্ততিতে এ বৈশিষ্ট্যের অনুপাত প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি না। তবে ইঁদুর, গিনিপিগ ও অন্যান্য প্রাণীতে অনুরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বংশগতি পরীক্ষা করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, দু'জন হেটারোজাইগাস স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম পুরুষ ও মহিলার সন্তান-সন্ততির মধ্যে ৯ : ৭ অনুপাতে যথাক্রমে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম এবং মূক-বধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

F_1 ও F_2 বংশের ফলাফল নিম্নরূপ :

পিতামাতা (P_1)- ফিনোটাইপ : ♂ মূক-বধির × ♀ মূক-বধির

জিনোটাইপ : aaBB × AAbb

গ্যামিট : aB, Ab

F_1 জনু : জিনোটাইপ : AaBb

ফিনোটাইপ : সকলেই স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম

F_2 জনু

পিতামাতা (P_2)- ফিনোটাইপ : ♂ স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম × ♀ স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম

জিনোটাইপ : AaBb × AaBb

গ্যামিট : AB, Ab, aB, ab, AB, Ab, aB, ab

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB *	AABb *	AaBB *	AaBb *
Ab	AABb *	AAbb ✌	AaBb *	Aabb ✌
aB	AaBB *	AaBb *	aaBB ✌	aaBb ✌
ab	AaBb *	Aabb ✌	aaBb ✌	aabb ✌

[*= স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন এবং ✌= মূক-বধির]

F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত = স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন : মূক-বধির = ৯ : ৭

ব্যাখ্যা : একজন মূক-বধির পুরুষের সাথে একজন মূক-বধির মহিলার বিয়ে হলে তাদের সকল সন্তান স্বাভাবিক বাক-শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হবে। তবে ঐ সন্তানদের জিনোটাইপ অনুরূপ জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হলে তাদের পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূক-বধির সন্তান ৯:৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে।

❑ **কাজ :** (i) মূক-বধির ও মূক-বধিরের (দুই জন মূক-বধির ব্যাক্তির) মধ্যে ক্রস ঘটালে F_1 জনু স্বাভাবিক হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর এবং F_2 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। (ii) জন্মগতভাবে মূক-বধির পুরুষ এবং মহিলা দম্পতির F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত বিশ্লেষণ কর। (iii) স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান মূক-বধির হওয়ার ঘটনার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাও।/কোনো দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক হলে তাদের সন্তানদের ফিনোটাইপের সংখ্যা ছকের সাহায্যে নির্ণয় কর। (iv) কোনো দম্পতির দুইজনই স্বাভাবিক হলে তাদের মূক-বধির সন্তান হওয়ার ঘটনা মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রম– বিশ্লেষণ কর। (v) স্বাভাবিক মা-বাবার সন্তান মূক-বধির হওয়ার ঘটনা মেন্ডেলের কোন সূত্রের ব্যতিক্রম বলে মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। (vi) দ্বৈত প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের ক্রিয়ায় F_2 তে ফিনোটাইপ কেমন হবে– বিশ্লেষণ কর। (vii) ১৩:৩ এর সাথে ৯:৭ এর F_2 জনুর তুলনামূলক আলোচনা কর।

১১.৪ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance)

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত অনেকগুলো নন-অ্যালিলিক জিন সম্মিলিতভাবে যদি কোনো জীবের একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন তাদের **পলিজিন** বা **মাল্টিপল জিন** (polygene or multiple gene) বলে। এই পলিজিনের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে **বহুজিনীয় বংশগতি** বা **পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স** বা **পরিমাণগত উত্তরাধিকার** (polygenic inheritance or quantitative inheritance) বলে। পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ফিনোটাইপের ক্রমাগত ভিন্নতা প্রদান করে। জিনতত্ত্ববিদ K. Mather (1954) পলিজিন নামকরণ করেন।

মানুষের ত্বকের রং, উচ্চতা, ওজন, চোখের রং, বুদ্ধিমত্তা, আচরণ, হৃদরোগ, কতিপয় ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, গাভীর দুধ, ভুট্টা বা গমের দানার রং ইত্যাদি পলিজিন জিন বা পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের কিছু বংশগতীয় রোগ দেখা যায়, যেমন– ক্যান্সার (cancer), অটিজম (autism), ডায়াবেটিস টাইপ ২ (diabetes type 2) প্রভৃতি।

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্সের বৈশিষ্ট্য

- এক্ষেত্রে কোনো জীবের ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য দুই বা ততোধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- এদের মাত্রা গণনার চেয়ে পরিমাপ দ্বারা নির্ণয় করা হয়।
- জীবের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মানুষের ত্বকের রং-এর ভিন্নতা আমরা সচরাচরই লক্ষ করে থাকি। এটি একটি পলিজেনিক বংশগতির উদাহরণ। ত্বকের রং রঞ্জক পদার্থের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। এই রঞ্জক পদার্থটির নাম মেলানিন। সমগ্র পরিমাণ রঞ্জক (মেলানিন) সঞ্চিত হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে জিনের ওপর এবং চর্মদ্বারা গৃহীত সূর্যালোকের ওপর। এই মেলানিন সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

C.B. Devenport (1913) বলেন নিগ্রো এবং শ্বেতকায় ব্যক্তিদের রঞ্জকের পার্থক্যের জন্য দু-জোড়া জিন দায়ী। এ জিনগুলো ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থান করে। এ জিনগুলোতে কোনো প্রকটতা দেখা যায় না,

চিত্র ১১.২ : পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স

CamScanner

তবে এদের সমপরিমাণ ও **ক্রমবর্ধিষ্ণু** (cumulative) প্রভাব থাকে। নিগ্রোদের এই জিনগুলো অতিরিক্ত মেলানিন সংশ্লেষে সাহায্য করে।

মনে করি, A ও B দুটি মেলানিনযুক্ত জিন এবং a ও b দুটি মেলানিনমুক্ত জিন।

সুতরাং নিগ্রোদের বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনোটাইপ AABB এবং শ্বেতকায়দের বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনোটাইপ aabb হবে। নিগ্রো পুরুষ (AABB) ও শ্বেতকায় স্ত্রীর (aabb) মধ্যে আন্তঃবিবাহ হলে F_1 বংশের সকল সন্তান মিউল্যাটো বা মাঝারি বর্ণের (AaBb) হয়। F_1 জনুর মিউল্যাটোদের মধ্যে বিয়ে হলে F_2 জনুতে ১/১৬ নিগ্রো (AABB) এবং ১/১৬ শ্বেতকায় (aabb) হয়। অবশিষ্টগুলো নানা রঙের বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং তা বর্ণসৃষ্টিকারী জিনগুলোর ওপর নির্ভর করে। ফলাফলটি নিচে ছক ও চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো–

পিতামাতা (P_1): ফিনোটাইপ ⟶ ♂ নিগ্রো × ♀ শ্বেতকায়

জিনোটাইপ ⟶ AABB aabb

গ্যামিট ⟶ (AB) (ab)

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ AaBb

ফিনোটাইপ ⟶ সবাই মিউল্যাটো (অন্তর্বর্তী রং বা মাঝারি বর্ণ)

F_2 জনু

পিতামাতা (P_2) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ মিউল্যাটো × ♀ মিউল্যাটো

জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb

গ্যামিট ⟶ (AB) (Ab) (aB) (ab) (AB) (Ab) (aB) (ab)

♂ গ্যামিট / ♀ গ্যামিট	(AB)	(Ab)	(aB)	(ab)
(AB)	AABB নিগ্রো	AABb কালো	AaBB কালো	AaBb মিউল্যাটো
(Ab)	AABb কালো	AAbb মিউল্যাটো	AaBb মিউল্যাটো	Aabb হালকা রং
(aB)	AaBB কালো	AaBb মিউল্যাটো	aaBB মিউল্যাটো	aaBb হালকা রং
(ab)	AaBb মিউল্যাটো	Aabb হালকা রং	aaBb হালকা রং	aabb শ্বেতকায়

ফলাফল : নিগ্রো (কুচকুচে কালো) = $^{১}/_{১৬}$, কালো (মিউল্যাটোদের চেয়ে কালো) = $^{৪}/_{১৬}$, মিউল্যাটো (অন্তর্বর্তী রং বা মাঝারি বর্ণ) = $^{৬}/_{১৬}$, হালকা রং (মিউল্যাটোদের চেয়ে ফর্সা) = $^{৪}/_{১৬}$ ও শ্বেতকায় (ফর্সা) = $^{১}/_{১৬}$

সুতরাং অপত্যদের মধ্যে রঙের বিভিন্ন মাত্রার অনুপাত = নিগ্রো : কালো : মিউল্যাটো : হালকা রং : শ্বেতকায়

= ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১।

১১.৫ লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Principle of Sex determination, XX-XY, XX-XO)

সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিকাল থেকেই। আজ পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি, যা দ্বারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব। মানুষের এই জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব না পাওয়া গেলেও মানুষসহ অন্যান্য এক লিঙ্গিক প্রাণীদের লিঙ্গ নির্ধারণ কৌশল জানা গেছে। যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত

CamScanner

বৈশিষ্টাবলী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে **লিঙ্গ নির্ধারণ** (sex determination) বলে। যেসব ক্রোমোজোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তাদের অটোজোম বলে। যেমন, মানুষের প্রতিকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়াই উভয় লিঙ্গে একই রকম এবং সেগুলোকে অটোজোম বলে। এদের A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেসব ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের **সেক্স ক্রোমোজোম বা হেটারোজোম** (sex chromosome or heterosome) বা **অ্যালোজোম** বলে। যেমন– মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে মাত্র এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম। এদের X ও Y বা O দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের কোনো জাইগোটে (ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণকোষ) XY থাকলে পুত্র সন্তান এবং XX থাকলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। স্ত্রী সদস্যে যেসব গ্যামিট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু একই রকম X ক্রোমোজোম থাকে বিধায় তাদেরকে **হোমোগ্যামিটিক সেক্স** (homogametic sex) এবং এসব গ্যামিটকে **হোমোগ্যামিট** (homogamete) বলে। অপরদিকে, পুরুষ সদস্যে দু'ধরনের গ্যামিট সৃষ্টি হয়। এক ধরনের গ্যামিটে X ক্রোমোজোম এবং অন্য ধরনের গ্যামিটে Y ক্রোমোজোম থাকে। গ্যামিটের ভিন্নতার কারণে পুরুষরা **হেটারোগ্যামিটিক সেক্সের** (heterogametic sex) অধিকারী হয় এবং এসব গ্যামিটকে **হেটারোগ্যামিট** (heterogamete) বলে।

Stevens, Wilson, Morgan প্রমুখ বিজ্ঞানী প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণে সেক্স ক্রোমোজোমের ভূমিকার গবেষণালব্ধ বিভিন্ন কৌশলের বিবরণ উপস্থাপন করেন। নিম্নলিখিত উপায়ে সেক্স ক্রোমোজোম পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় :

ধরন	হেটারোজাইগাস	শুক্রাণু	ডিম্বাণু	স্ত্রী	পুরুষ	যেসব প্রাণীতে ঘটে
XX-XY	পুরুষ	X ও Y	X	XX	XY	*Drosophila*-সহ বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ এবং মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী।
XX-XO	পুরুষ	X ও O	X	XX	XO	ঘাসফড়িং, গান্ধিপোকা, আরশোলা, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা ও হেটারোপ্টেরা শ্রেণিভুক্ত প্রাণী ইত্যাদি পতঙ্গ।
ZZ-ZW	স্ত্রী	Z	Z ও W	ZW	ZZ	পাখি, প্রজাপতি ও কিছু মাছ।
ZZ-ZO	স্ত্রী	Z	Z ও O	ZO	ZZ	কিছু মথ ও প্রজাপতি।

সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত লিঙ্গ নির্ধারণের দুটি নীতি আলোচনা করা হলো :

১। XX-XY নীতি : মানুষসহ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী ও অনেক নিম্ন শ্রেণির প্রাণী (যেমন– ড্রসোফিলা, বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ ইত্যাদি) এবং কিছু উদ্ভিদেও (যেমন– গাঁজা, তেলাকুচা, ইলোডিয়া ইত্যাদি) এই প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। **N. Stevens** এবং **E. B. Wilson** (1905) প্রথম এ পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীরা কোষে দুটি X-ক্রোমোজোম বহন করে। কিন্তু পুরুষ প্রাণীরা কোষে একটি X ক্রোমোজোম ও একটি Y ক্রোমোজোম বহন করে। ফলে XX ক্রোমোজোম সমন্বয়ের জন্য কন্যা এবং XY সমন্বয়ের জন্য পুত্র সন্তান সৃষ্টি হয়। এ কারণে স্ত্রী প্রাণীদের হোমোগ্যামিটিক অর্থাৎ গ্যামিট তৈরির সময় একই রকমের (শুধু X ক্রোমোজোমযুক্ত) গ্যামিট উৎপন্ন করে। অপরদিকে পুরুষদের হেটারোগ্যামিটিক বলা হয় কারণ তারা X ও Y ক্রোমোজোমযুক্ত দু'ধরনের গ্যামিট উৎপন্ন করে।

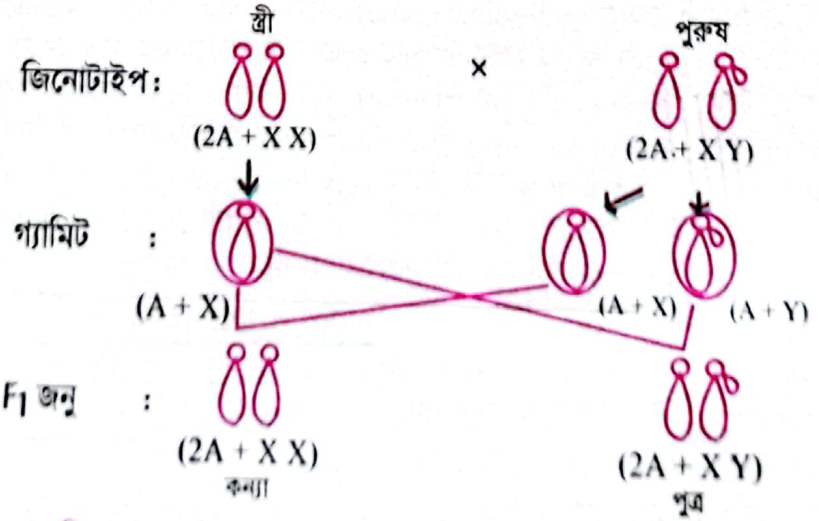

চিত্র ১১.৩ক : XX-XY পদ্ধতি দ্বারা মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

২। XX-XO নীতি : ঘাসফড়িং, গান্ধি পোকা, আরশোলা, ছারপোকা, অর্থোপ্টেরা ও হেটারোপ্টেরা ইত্যাদি পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীদের স্ত্রী হোমোগ্যামিটিক। এদের দুটি XX ক্রোমোজোম থাকায় প্রতিটি ডিম্বাণু একটি 'X' ক্রোমোজোম বহন করে। অপরদিকে পুরুষ প্রাণীদের মাত্র একটি X ক্রোমোজোম থাকে, কোনো Y ক্রোমোজোম থাকে না। অর্থাৎ স্ত্রী ক্রোমোজোম 2A + XX এবং পুরুষের ক্রোমোজোম 2A + XO (Y না থাকায় 'O' শূন্য লেখা হয়।) স্ত্রী হোমোগ্যামিটিক, ফলে সমস্ত ডিম্বাণু একই ধরনের (A+X)। কিন্তু পুরুষে দু'ধরনের গ্যামিট (A + X) ও (A + O) উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকারের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে অপত্য স্ত্রী (2A+XX), অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকার শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে অপত্য পুরুষ (2A+XO) সৃষ্টি হয়।

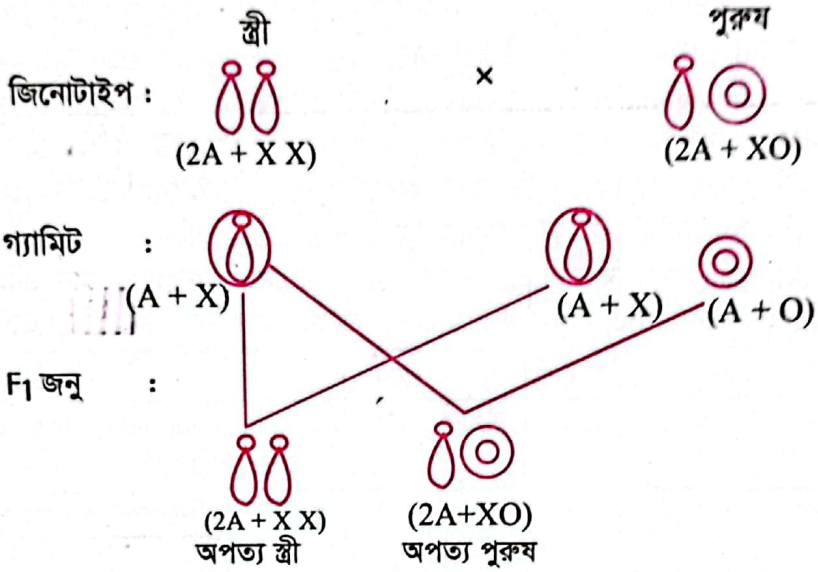

চিত্র ১১.৩খ : XX-XO পদ্ধতি দ্বারা পতঙ্গের লিঙ্গ নির্ধারণ

১১.৬ সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder)

মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে। এর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোম দেহ গঠন করে, এদের **অটোজোম** (autosome) বলে। বাকি ১ জোড়া ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে, এদের **সেক্স ক্রোমোজোম** (sex-chromosome) বলে। সেক্স ক্রোমোজোমকে **আলোজোমও** (allosome) বলে। এদের X ও Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমকে XY এবং মহিলাদের লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমকে XX রূপে চিহ্নিত করা হয়। কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন সেক্স ক্রোমোজোমের ওপর অবস্থান করে। যেসব জিন সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থান করে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের **সেক্স লিংকড জিন** (sex-linked gene) বলে।

সাধারণত 'X'-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে **সেক্স লিংকড জিন** (sex-linked gene) বলে। অটোজোম বাহিত জিনকে **অটোজোমাল জিন** (autosomal gene) বলে। আর 'Y'-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে **হোলান্ড্রিক জিন** (holandric gene) বলে। **সেক্স লিংকড জিনের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে লিঙ্গ জড়িত বংশগতি বা সেক্স লিংকড ইনহেরিট্যান্স** (sex-linked inheritance) বলা হয়। সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের দেহে যে বিভিন্ন ধরনের বংশগতীয় অস্বাভাবিকতা ও রোগ সৃষ্টি হয় তাদের একত্রে **লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা বা সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার** (sex-linked disorder) বলে। মানুষের 'X'-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি ডিসঅর্ডার হলো- বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসকুলার ডিস্ট্রফি, মায়োপিয়া, রাতকানা ইত্যাদি। মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টি সেক্স-লিংকড জিন পাওয়া গেছে।

সেক্সলিংকড ডিসঅর্ডারের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে–

১। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জীনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে X ক্রোমোজোম দ্বারা বাহিত হয়, তবে কিছুক্ষেত্রে Y ক্রোমোজোম (মানুষের কানের লতির পশমের জন্য দায়ী জীন) দ্বারা বাহিত হয়।

২। এসব রোগের জীন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির।

৩। সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার মহিলাদের চেয়ে পুরুষে বেশি প্রকাশিত হয়, কারণ পুরুষে এ জীন উপস্থিত থাকলেই (অর্থাৎ হেটারোজাইগাস হলেও) বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে কিন্তু স্ত্রীদের হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ ঘটে।

CamScanner

৪। সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার বৈশিষ্ট্যধারী পুরুষের সকল কন্যা সন্তানই এই বৈশিষ্ট্যের বাহক হবে, কোন পুত্র সন্তানে এ জিন সঞ্চারিত হয় না।

৫। সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার বৈশিষ্ট্যধারী স্ত্রীর সকল পুত্র সন্তানে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, কিন্তু কন্যারা বাহক হয়।

৬। সাধারণত বৈশিষ্ট্যটি একটি generation skip করে। কারণ জিনটি দাদা থেকে বাহক কন্যার মাধ্যমে নাতিতে সঞ্চারিত হয়।

৭। পিতার সেক্স-লিংকড ডিসঅর্ডার কন্যার মধ্য দিয়ে দৌহিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, একে **ক্রিস-ক্রস ইনহেরিট্যান্স** (criss-cross inheritance) বলে।

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : ক্রিস-ক্রস বংশানুক্রম (Criss-cross inheritance) : X ক্রোমোজোম সংশ্লিষ্ট বংশগতির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যটি পুরুষে প্রকাশিত হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে তা কন্যা (F_1 জন্ম) → নাতি (F_2 জন্ম) → প্রপৌত্রী → (F_3 জন্ম)-এই অনুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এভাবে সঞ্চারণের সময় পুরুষে ওই জিনের (বা রোগের) বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, কিন্তু মহিলারা কেবল রোগটির বাহক হয়। এই ধরনের বংশগতির ধারাকে ক্রিস-ক্রস বংশানুক্রম বলে। যেমন– লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রিস-ক্রস বংশানুক্রম দেখা যায়।]

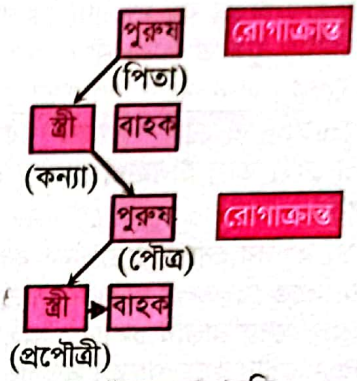

বংশানুক্রমের প্রকৃতি

মানুষের কয়েকটি সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা)

সেক্স লিংকড	বিবরণ
১। লাল বর্ণান্ধতা (Red colour blindness)	রেটিনায় অস্বাভাবিক লাল কোণ (cone) পিগমেন্টের উপস্থিতির কারণে লাল বর্ণ অনুধাবনে অক্ষমতা।
২। সবুজ বর্ণান্ধতা (Green colour blindness)	রেটিনায় অস্বাভাবিক সবুজ কোণ পিগমেন্টের উপস্থিতির কারণে সবুজ বর্ণ অনুধাবনে অক্ষমতা।
৩। হিমোফিলিয়া-A (Haemophilia -A)	Clotting factor VIII এর অনুপস্থিতির জন্য রক্ত তঞ্চনে (blood clotting) অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ।
৪। হিমোফিলিয়া-B (Haemophilia- B)	Clotting factor XI এর অনুপস্থিতির জন্য রক্ত তঞ্চনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ।
৫। এনহাইড্রোটিক এক্টোডার্মাল ডিসপ্লাসিয়া (Anhidrotic ectodermal dysplasia)	দাঁত, লোম এবং ঘর্মগ্রন্থির অনুপস্থিত।
৬। রাতকানা (Night blindness)	রাতে কোনো জিনিস দেখতে অসুবিধা বোধ করা।
৭। মায়োপিয়া (Myopia)	দৃষ্টিক্ষীণতা, নিকটের জিনিস ভালোভাবে দেখতে না পারা।
৮। অপটিক এট্রফি (Optic atrophy)	অপটিক নার্ভের ক্ষয়িষ্ণুতা।
৯। হোয়াইট ফোরলক (White forelock)	মাথার চুল আংশিক সাদা হওয়া।
১০। ডুশিনি মাসকুলার ডিস্ট্রপি (Duchenee Muscular dystrophy- DMD)	পেশির জটিলতায় ১০ বছরের মধ্যেই চলনশক্তি লোপ পায় এবং কদাচিৎ ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।
১১। জুভেনাইল গ্লুকোমা (Juvenile glucoma)	চক্ষুগোলকের কাঠিন্য এবং ছানি পড়া।
১২। টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন (Testicular feminization)	পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হয়।
১৩। ফ্রাজাইল X সিন্ড্রোম (Fragile X syndrome)	অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা।
১৪। স্প্যাজটিক প্যারাপেলাজিয়া (Spastic paraplegia)	মাংসপেশির আংশিক অবশতা ও অনিয়ত কাঠিন্য।
১৫। হাইপারট্রাইকোসিস (hipertricosis)	সমগ্র দেহে ঘন লোমের উপস্থিতি।
১৬। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insupidus)	অধিক মূত্রত্যাগ (copious urination), শারীরিক অক্ষমতা।

CamScanner

নিচে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার (বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া এবং মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি) নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. বর্ণান্ধতা (Colour Blindness)

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Red Green Colour Blindness) : **যে বংশগত রোগে, কোনো মানুষ বিভিন্ন বর্ণের বিশেষত লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য করতে পারে না বা চিনতে পারে না, সেই প্রকার অস্বাভাবিকতাকে বর্ণান্ধতা (colour blindness) বলে।** মানুষের 'X' ক্রোমোজোমে বিদ্যমান প্রকট জিন চোখের রেটিনার বর্ণ শনাক্তকারী কোণ কোষগুলোর স্বাভাবিক গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মিউটেশনের কারণে এই জিনের একটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল সৃষ্টি হয়, যেটি রেটিনার লাল-সবুজ বর্ণ সংবেদী কোণ কোষগুলোর গঠন ব্যাহত করে। ফলে এই প্রচ্ছন্ন জিনধারী মানুষ লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। একে **লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা** (red-green colour blindness) বলে। এটি একটি লিঙ্গ জড়িত রোগ। লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা রোগটিই বর্ণান্ধ মানুষের মাঝে সর্বাধিক (প্রায় ৯৫%) পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানী **John Dalton** এ রোগ সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ করেন। এ জন্য রোগটিকে **Daltonism** বলে। **এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, তবে ইসিহারা টেস্ট** (ishihara colour test)-এর মাধ্যমে বর্ণান্ধতা পরীক্ষা করা হয়।

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার রোগী যে সমস্ত সমস্যায় পড়তে পারে :

(১) বাজার থেকে কাঁচাপাকা ফল ও শাকসবজি কেনাকাটায় সমস্যা হতে পারে। (২) পছন্দের রঙিন ফুল কিনে উপহার দিতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারে। (৩) ট্রাফিক সংকেত হিসেবে লাল ও সবুজ আলো ব্যবহৃত হয়। তাই বর্ণান্ধ ব্যক্তিদের রাস্তায় চলাচলে অসুবিধা হতে পারে। (৪) রঙিন জামা-কাপড় কেনার ক্ষেত্রে বর্ণান্ধ মানুষ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং বিয়ের আগে বর্ণান্ধতার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

মনে করি, দৃষ্টির স্বাভাবিক জিন = X^+
বর্ণান্ধতা নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^c
∴ স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষের জিনোটাইপ = X^+Y
স্বাভাবিক দৃষ্টির মহিলার জিনোটাইপ = X^+X^+
বর্ণান্ধ পুরুষের জিনোটাইপ = X^cY
বর্ণান্ধ মহিলার জিনোটাইপ = X^cX^c
এবং বাহক মহিলার জিনোটাইপ = X^+X^c

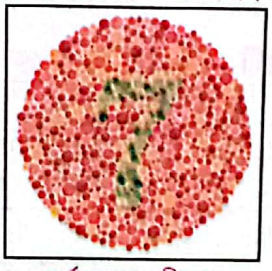
বর্ণান্ধতার পরীক্ষা
(ইশিহারা টেস্ট)

স্বাভাবিক ও বর্ণান্ধ মানুষ
যেভাবে আপেলের রঙ দেখতে পান

(ক) বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মহিলার সঙ্গে বিয়ে হলে F_1 বংশের সকল সন্তান স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (এদের মধ্যে কন্যারা বর্ণান্ধতার বাহক হয়) হবে এবং পরবর্তী বংশের অর্ধেকে এ জিন সঞ্চারিত হয়।

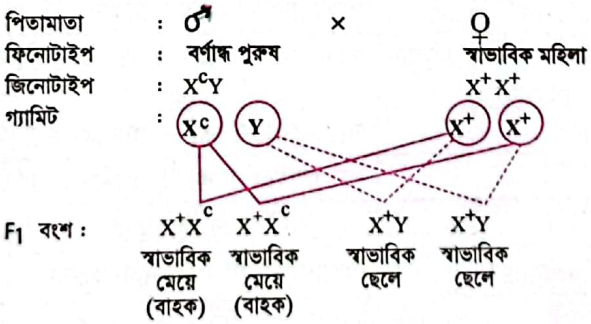

F_1 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক (X^+X^c) = ৫০% এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে (X^+Y) = ৫০%

F_1 বংশের স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে বর্ণান্ধবাহক মহিলার বিয়ে হলে F_2 বংশে চার সন্তানের মধ্যে দু'জন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), **একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্মলাভ করে।**

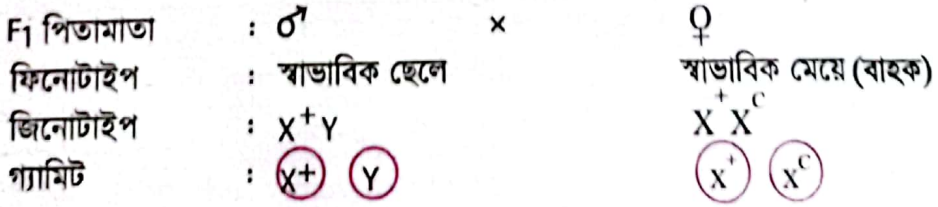

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	X^+	Y
X^+	X^+X^+ স্বাভাবিক মেয়ে	X^+Y স্বাভাবিক ছেলে
X^C	X^+X^C স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^CY বর্ণান্ধ ছেলে

এ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণান্ধ পিতার স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কন্যার অর্ধেক পুত্র হবে বর্ণান্ধ ও অপর অর্ধেক পুত্র হবে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন। এভাবে বৈশিষ্ট্যটি কন্যার মাধ্যমে বাহিত হয়ে নাতির মধ্যে প্রকাশিত হয়।

F_2 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে $(X^+X^+) = ২৫\%$, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে $(X^+Y) = ২৫\%$, স্বাভাবিক মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক $(X^+X^C) = ২৫\%$ এবং বর্ণান্ধ ছেলে $(X^CY) = ২৫\%$

(খ) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ও বর্ণান্ধ মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো পুরুষের সঙ্গে বর্ণান্ধ মহিলার বিয়ে হলে F_1 বংশের সকল পুত্রসন্তানই বর্ণান্ধ এবং কন্যাসন্তান স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (সকলেই বর্ণান্ধতার বাহক) হবে।

পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : স্বাভাবিক পুরুষ — বর্ণান্ধ মহিলা
জিনোটাইপ : X^+Y — X^CX^C
গ্যামিট : X^+, Y — X^C, X^C

F_1 বংশ : X^+X^C (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^+X^C (স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)), X^CY (বর্ণান্ধ ছেলে), X^CY (বর্ণান্ধ ছেলে)

F_1 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক $(X^+X^C) = ৫০\%$ এবং বর্ণান্ধ ছেলে $(X^CY) = ৫০\%$।

F_1 বংশের জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে F_2 বংশে ১টি করে বর্ণান্ধ পুত্র ও কন্যা এবং ১টি করে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা (বর্ণান্ধতার বাহক) পাওয়া যাবে।

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀
ফিনোটাইপ : বর্ণান্ধ ছেলে — স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)
জিনোটাইপ : X^CY — X^+X^C
গ্যামিট : X^C, Y — X^+, X^C

F_2 বংশের ফলাফল নিচে চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখানো হলো–

♀ \ ♂	X^C	Y
X^+	X^+X^C স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^+Y স্বাভাবিক ছেলে
X^C	X^CX^C বর্ণান্ধ মেয়ে	X^CY বর্ণান্ধ ছেলে

F_2 বংশের ফলাফল : স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ে কিন্তু বর্ণান্ধতার বাহক $(X^+X^C) = ২৫\%$, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছেলে $(X^+Y) = ২৫\%$, বর্ণান্ধ মেয়ে $(X^CX^C) = ২৫\%$ এবং বর্ণান্ধ ছেলে $(X^CY) = ২৫\%$।

উল্লেখিত পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বর্ণান্ধ মহিলার সকল পুত্রই বর্ণান্ধ ও কন্যারা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন (সকলেই বর্ণান্ধতার বাহক) এবং একজন বর্ণান্ধ মহিলার পিতা সবসময়ই বর্ণান্ধ আর মাতা হবে একজন বাহক।

CamScanner

মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হয় : কারণ–

১। বর্ণান্ধতার জিনটি X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত ও এটি প্রচ্ছন্নধর্মী হওয়ায় পুরুষে এই বৈশিষ্ট্য হেমিজাইগাস অবস্থায় অর্থাৎ পুরুষে X-ক্রোমোজোমে বর্ণান্ধের জিন থাকলেই (X^cY) প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু মহিলাদের এই বৈশিষ্ট্য হোমোজাইগাস অবস্থা (X^cX^c) ছাড়া প্রকাশ পায় না।

২। কোনো মহিলা যদি তার পিতা অথবা মাতা যেকোনো একজনের নিকট থেকে বর্ণান্ধতার প্রচ্ছন্ন জিন (X^c) এবং অন্যজনের নিকট থেকে স্বাভাবিক প্রকট জিন (X^+) পায় তাহলে সে হেটারোজাইগাস অবস্থা (X^+X^c) প্রাপ্ত হয়। ফলে এ অবস্থায় মহিলা বর্ণান্ধতা জিনের বাহক হয় এবং বাহক মহিলারা কখনো বর্ণান্ধ হয় না। আবার পুরুষ কখনো বাহক হতে পারে না। সুতরাং বলা যায়, বর্ণান্ধতা মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরই বেশি হয়।

বিভিন্ন ধরনের পিতামাতার পুত্র ও কন্যার বর্ণান্ধতার তালিকা নিম্নরূপ–

মাতা × পিতা		কন্যা			পুত্র	
		স্বাভাবিক	বাহক	বর্ণান্ধ	স্বাভাবিক	বর্ণান্ধ
(১) স্বাভাবিক	বর্ণান্ধ	–	১০০%	–	১০০%	–
(২) বাহক	স্বাভাবিক	৫০%	৫০%	–	৫০%	৫০%
(৩) বর্ণান্ধ	স্বাভাবিক	–	১০০%	–	–	১০০%
(৪) বাহক	বর্ণান্ধ	–	৫০%	৫০%	৫০%	৫০%

তালিকার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বর্ণান্ধতার মাত্রা বেশি।

২. হিমোফিলিয়া (Haemophilia) বা ব্লিডার্স ডিজিস (Bleeder's Disease)

মানুষের যে বংশগত রোগের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান (ক্ষত, কাটা স্থান) থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধে না তাকে হিমোফিলিয়া বলে। John Conrad Otto (1803; Philadelphia physician) প্রথম হিমোফিলিয়া রোগ আবিষ্কার করেন। হিমোফিলিয়া একটি বিশেষ বংশগত রোগ যা 'X' ক্রোমোজোমের একটি প্রচ্ছন্ন **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene) এর মাধ্যমে বাহিত হয়। যেহেতু হিমোফিলিয়া প্রচ্ছন্ন জিন, তাই এই রোগ স্ত্রীলোকদের সাধারণত হয় না। যদি কোনো স্ত্রী লোকের উভয় 'X' ক্রোমোজোমই এই প্রকার জিন বহন করে কেবল সে ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকদের হিমোফিলিয়া হতে পারে। স্ত্রীলোক এই রোগের বাহক। কেবল পুত্রসন্তানদের ক্ষেত্রেই এই রোগ প্রকাশ পায়। হিমোফিলিয়ায় মহিলা অপেক্ষা পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণত হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত পুরুষ এবং মহিলারা ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই রক্তক্ষরণজনিত কারণে মারা যায়।

হিমোফিলিয়ার প্রকারভেদ : হিমোফিলিয়া প্রধানত দু-প্রকারের হয়ে থাকে। যথা–

(ক) হিমোফিলিয়া A বা ক্ল্যাসিক্যাল হিমোফিলিয়া (Classical Haemophilia) বা রয়্যাল হিমোফিলিয়া (Royal haemophilia) : এইরূপ হিমোফিলিয়া রক্তের প্লাজমার **অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর** (Antihilic factor-AHF) বা **ফ্যাক্টর VIII**-এর অভাবের জন্য ঘটে। এই ফ্যাক্টরটি 'HEM-A' জিনের সাহায্যে উৎপাদিত হয়। প্রায় ৮০% হিমোফিলিয়া এই প্রকারের হয়। এ রকম হিমোফিলিয়ায় প্রায় ১০,০০০ জন পুরুষে একজন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) হিমোফিলিয়া B বা খ্রিষ্টমাস রোগ (Christmas disease) : স্ফিফেন খ্রিষ্টমাস নামে একজন রোগীর দেহে এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে বলে একে খ্রিষ্টমাস রোগও বলে। এইরূপ হিমোফিলিয়া মানুষের রক্তে **প্লাজমা থ্রোম্বোপ্লাসটিন** (Plasma thromboplastin) বা ক্রিসমাস ফ্যাক্টর বা **ফ্যাক্টর IX**-এর অভাবে ঘটে। এই ফ্যাক্টর **'HEM-B'** জিনের সাহায্য উৎপাদিত হয়। প্রায় ২০% হিমোফিলিয়া এই প্রকারের হয়।

HEM-A ও HEM-B জিন দুটি মানুষের ক্রোমোজোমে বেশ খানিকটা ব্যবধানে অবস্থান করে। X ক্রোমোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের বহিঃপ্রকাশে এই রোগ ঘটে। হিমোফিলিয়া-A রাজকীয় হিমোফিলিয়া (royal haemophilia) নামেও পরিচিত। কারণ, এই রোগ ইউরোপের রাজপরিবারে খুব বেশি মাত্রায় ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়া সর্বপ্রথম এই রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটির ধারণ করেন (বাহক) ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করেন। উল্লেখ্য যে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার চার কন্যার মধ্যে দুই কন্যা (অ্যালিস ও বিয়াট্রিশ) হিমোফিলিয়া রোগের বাহক ছিলেন।

এছাড়াও **হিমোফিলিয়া C** (Haemophilia C) নামক অটোজোমাল রোগ দেখা যায়। এটি লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট রোগ নয়। অটোজোমে অবস্থিত একটি প্রচ্ছন্ন জিন যা XI নম্বর ফ্যাক্টর বা Plasma thromboplastin antecedent (PTA) এর অস্বাভাবিক সংশ্লেষ ঘটায়। ফলে রক্তজমাট বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিমোফিলিয়া 'C' আক্রান্ত ব্যক্তিরা মোট হিমোফিলিয়া আক্রান্তদের ১%-এরও কম।

CamScanner

উদাহরণসহ জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা :

মনে করি, হিমোফিলিয়া নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^h এবং স্বাভাবিক (প্রকট জিন) জিন = X^H

সুতরাং হিমোফিলিয়াক পুরুষের জিনোটাইপ = X^hY; হিমোফিলিয়াক স্ত্রীলোকের জিনোটাইপ = $X^h X^h$ স্বাভাবিক পুরুষের জিনোটাইপ = $X^H Y$; স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের জিনোটাইপ = $X^H X^H$ এবং হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের জিনোটাইপ = $X^H X^h$

(ক) হিমোফিলিয়াক পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যেবিয়ের ক্ষেত্রে

একজন হিমোফিলিয়াক পুরুষের সঙ্গে একজন স্বাভাবিক মহিলার বিয়ে হলে কেমনভাবে সন্তান-সন্ততিতে হিমোফিলিয়ার সঞ্চারণ ঘটবে তা নিচে দেখানো হলো–

পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: হিমোফিলিয়াক পুরুষ		স্বাভাবিক মহিলা
জিনোটাইপ	: $X^h Y$		$X^H X^H$
গ্যামিট	:		

F_1 বংশ :	X^HX^h স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^HX^h স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	$X^H Y$ স্বাভাবিক ছেলে	$X^H Y$ স্বাভাবিক ছেলে

F_1 বংশের ফলাফল : হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা (X^HX^h) = ৫০% এবং স্বাভাবিক পুত্র ($X_H Y$) = ৫০%

F_2 বংশের ফলাফল (চেকার বোর্ডের সাহায্যেও দেখানো যায়) :

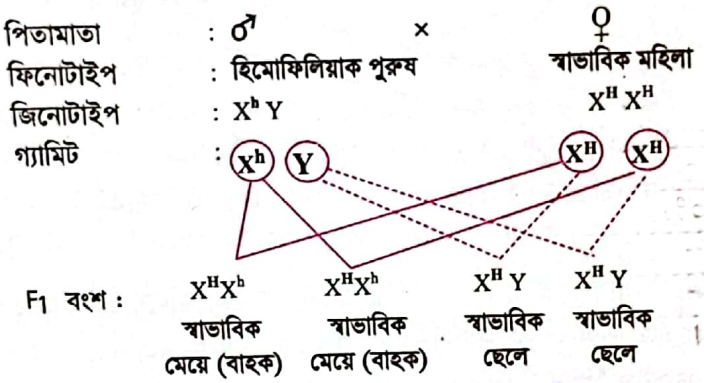

F_1 পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: স্বাভাবিক ছেলে		স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)
জিনোটাইপ	: $X^H Y$		X^HX^h
গ্যামিট	:		

F_2 বংশ :	X^HX^H স্বাভাবিক মেয়ে	X^HX^h স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^HY স্বাভাবিক পুরুষ	X^hY হিমোফিলিয়াক পুরুষ

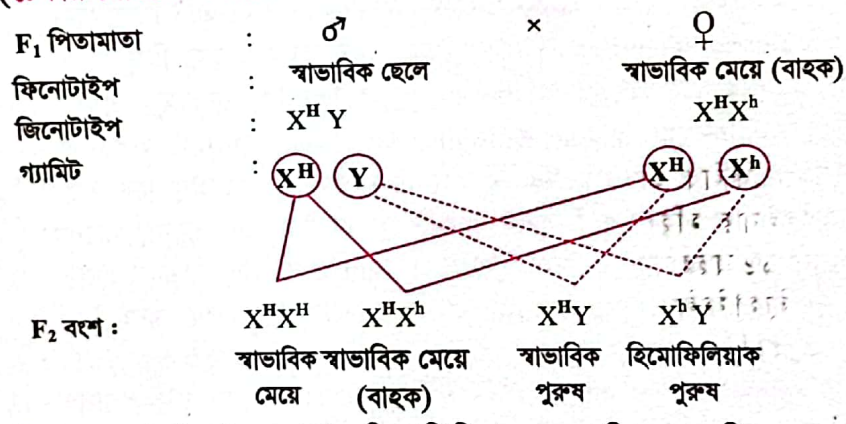

ফলাফল : স্বাভাবিক কন্যা ($X^H X^H$) = ২৫%, হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা ($X^H = X^h$) = ২৫%, স্বাভাবিক পুত্র ($X^H Y$) = ২৫% এবং হিমোফিলিয়াক পুত্র ($X^h Y$) = ২৫%।

(খ) স্বাভাবিক পুরুষ ও হিমোফিলিয়াক মহিলার মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে

স্বাভাবিক পুরুষ ও হিমোফিলিয়াক মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে কেমনভাবে সন্তান-সন্ততিতে হিমোফিলিয়ার সঞ্চারণ ঘটবে তা নিচে দেখানো হলো :

F_1 পিতামাতা	: ♂	×	♀
ফিনোটাইপ	: স্বাভাবিক পুরুষ		হিমোফিলিয়াক মহিলা
জিনোটাইপ	: X^HY		X^hX^h
গ্যামিট	:		

F_2 বংশ :	X^HX^h স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^HX^h স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)	X^hY হিমোফিলিয়াক ছেলে	X^hY হিমোফিলিয়াক ছেলে

CamScanner

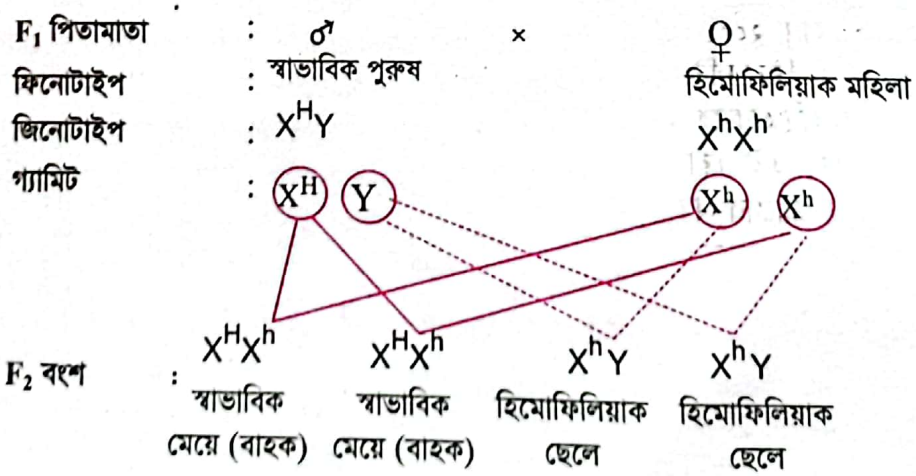

F_1 বংশের ফলাফল : হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা (X^HX^h) = ৫০% এবং হিমোফিলিয়াক পুত্র (X^hY) = ৫০%

F_2 বংশের ফলাফল (চেকার বোর্ডের সাহায্যেও দেখানো যায়) :

F_1 পিতামাতা : ♂ × ♀

ফিনোটাইপ : হিমোফিলিয়াক পুরুষ — স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক)

জিনোটাইপ : X^hY — X^HX^h

গ্যামিট : X^h, Y — X^H, X^h

F_2 বংশ : X^HX^h স্বাভাবিক মেয়ে (বাহক); X^hX^h হিমোফিলিয়াক মেয়ে; X^HY স্বাভাবিক ছেলে; X^hY হিমোফিলিয়াক ছেলে

ফলাফল : হিমোফিলিয়ার বাহক কিন্তু স্বাভাবিক কন্যা (X^HX^h) = ২৫%, হিমোফিলিয়াক কন্যা (X^hX^h) = ২৫%, স্বাভাবিক পুত্র (X^HY) = ২৫% এবং হিমোফিলিয়াক পুত্র (X^hY) = ২৫%।

৩. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (Muscular Dystrophy)

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি একটি সেক্স লিংকড বৈশিষ্ট্য। ইহা বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়ার মতো প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জিন শুধু 'X' ক্রোমোজোমে পাওয়া যায় এবং এটি **ডিস্ট্রফিন** (dystrophin) নামক এক ধরনের প্রোটিন (এনজাইম) তৈরি করে যা ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা পেশির প্রতিস্থাপন ঘটায়। মানবদেহে ত্রিশের অধিক মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রয়েছে। এদের মধ্যে **ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** (Duchenne Muscular Dystrophy-DMD) সবচেয়ে জটিল। ফরাসি স্নায়ুবিশেষজ্ঞ **G. B. A. Duchenne** (1806-1875) এর নামানুসারে এই রোগের নামকরণ করা হয়েছে। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি একটি দুর্লভ জিনঘটিত রোগ, যাকে শিশুদের পেশি ক্ষয়ে যাওয়া রোগও বলা হয়। ছেলে শিশুরাই এ রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত শিশুর শারীরিক কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় শৈশবকাল থেকেই। ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা পেশি প্রতিস্থাপিত হওয়ার কারণে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সাধারণত ১০-১২ বছর বয়সেই একটি শিশুর দুটি চেয়ার সঙ্গী হয়ে যায়। পেশিক্ষয় বহাল থাকার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত ২০ বছরের বেশি বাঁচে না। এ রোগটি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)-এ মাত্র একজনে পরিলক্ষিত হতে পারে। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রোগের জন্য দায়ী জিনটি X-ক্রোমোজোমে হেমিজাইগাস অবস্থায় পুরুষে রোগের প্রকাশ ঘটায় এবং হোমোজাইগাস অবস্থায় মহিলাদের ক্ষেত্রে এ রোগটি প্রকাশ পায়।

DMD আক্রান্ত বালক

কিন্তু বাস্তবে এটা প্রায় অসম্ভব হয়। কেননা কোনো মহিলার মাসক্যুলার ডিস্ট্রফির একটি জিন অবশ্যই পিতার X-ক্রোমোজোম থেকে আসতে হয়। কিন্তু পুরুষ যৌন পরিপক্বতা লাভের পূর্বেই পুরোপুরি বিকলাঙ্গ হয়, এমনকি ২০ বছরের মধ্যে মারা যায়। তবে মিউটেশনের ফলে জিনটির প্রকাশ ঘটতে পারে।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে জিনের ভূমিকা : লিঙ্গ জড়িত বংশগতীয় যত রোগ আছে তার মধ্যে ডুশেন মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি X ক্রোমোজোম বাহিত রোগ। ডিস্ট্রফিন প্রোটিন উৎপন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জিনে কিছু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার ফলে তীব্র পেশি ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের অবস্থাকে ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি বলে। পুরুষ ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি দ্বারা আক্রান্ত হয়। নারীদের এরোগ দেখা যায় না বললেই চলে। নারীরা এ রোগের বাহক হয়।

একজন স্বাভাবিক পুরুষের সাথে একজন বাহক ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিক মহিলার বিয়ে হলে– নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যাবে :

মনে করি, ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (DMD) নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^d

এবং স্বাভাবিক (প্রকট জিন) জিন = X^D

CamScanner

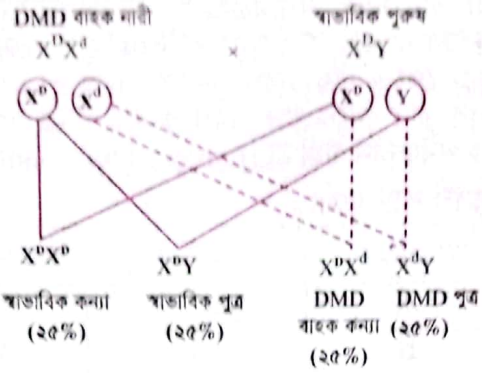

অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক পুরুষের সাথে একজন বাহক ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিক মহিলার বিয়ে হলে ৫০% পুত্রের মধ্যে এ রোগ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ৫০% কন্যা সন্তান পুনরায় বাহক হয়।

❑ **কাজ :** (i) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন বর্ণান্ধতা বাহক কন্যা ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের বিয়ে হলে তাদের সন্তানের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ কর।/স্বাভাবিক ছেলের সাথে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু বর্ণান্ধ বাহক মেয়ের বিয়ে হলে কী অনুপাতে ঘটনাটি প্রকাশ পাবে? চেকার বোর্ডের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। (ii) স্বাভাবিক পুরুষ কিন্তু বর্ণান্ধ স্ত্রীর জিনোটাইপ ব্যাখ্যা কর। (iii) বর্ণান্ধ দম্পতির সন্তানেরা কীরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে– বিশ্লেষণ কর। (iv) স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং বর্ণান্ধ চার ভাই-বোনের জিনোটাইপ উল্লেখ কর। (v) স্বাভাবিক পুরুষ ও স্বাভাবিক (হিমোফিলিয়া বাহক) মহিলা দম্পতির প্রথম বংশধরে ফিনোটাইপ অনুপাত ব্যাখ্যা কর। (vi) একজন DMD পুরুষের সাথে একজন বাহক DMD মহিলার বিয়ে হলে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মাঝে কী অনুপাতে DMD প্রকাশ পাবে? **তথ্য :** মনে কর, স্বাভাবিক (প্রকট জিন) জিন = X^D এবং ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি (DMD) নিয়ন্ত্রণকারী জিন = X^d।

১১.৭ রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ

ABO রক্ত গ্রুপ (ABO-Blood group)

একজন মানুষের রক্ত আরেকজন মানুষের দেহে সঞ্চারণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইচ্ছামতো কোনো মানুষকে রক্ত দেওয়া যায় না। কারণ সব মানুষের রক্তের বৈশিষ্ট্য এক রকম নয়। লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে **ABO রক্ত গ্রুপ** বা সংক্ষেপে **রক্ত গ্রুপ** (blood group) বলা হয়। 1901 সালে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী **Karl Landsteiner** রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন। এজন্য **Landsteiner**-এর নামানুসারে অনেক সময় এ ব্লাড গ্রুপকে **Landsteiner**-এর **blood group** বলে। মানবদেহে প্রায় ৪০০ ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র ৩০টি সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা গেছে। 1965 সাল পর্যন্ত আরও ১৩টি ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষের প্রধান রক্ত গ্রুপ হলো **ABO রক্ত গ্রুপ** ও **Rh রক্ত গ্রুপ**। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রক্ত গ্রুপ হলো– MN রক্ত গ্রুপ, কেলি রক্ত গ্রুপ, লুইস রক্ত গ্রুপ, ডাফি রক্ত গ্রুপ ইত্যাদি।

অ্যান্টিজেন (antigen) এক ধরনের **প্রোটিন** বা **গ্লাইকোপ্রোটিন** জাতীয় পদার্থ যা অ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগায়। অ্যান্টিজেনকে **অ্যাগ্লুটিনোজেন** (agglutinogen) বা **আইসোঅ্যাগ্লুটিনোজেনও** (isoagglutinogen) বলা হয়। এটি জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে।

বিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** মানুষের রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করে তা A, B, AB এবং O-এ চারটি গ্রুপের নামকরণ করেন। অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে এসকল ব্লাড গ্রুপকে এভাবে বর্ণনা করা যায়–

গ্রুপ-A : এ শ্রেণির রক্তে A অ্যান্টিজেন ও b অ্যান্টিবডি থাকে।

গ্রুপ-B : এ শ্রেণির রক্তে B অ্যান্টিজেন ও a অ্যান্টিবডি থাকে।

গ্রুপ-AB : এ শ্রেণির রক্তে A ও B অ্যান্টিজেন থাকে এবং কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না।

গ্রুপ-O : এ শ্রেণির রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না কিন্তু a ও b অ্যান্টিবডি থাকে।

কোনো মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে ওই মানুষের রক্তের রক্তরসে (plasma) একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। রক্তরসের ওই বিশেষ ধরনের প্রোটিনকে **অ্যান্টিবডি** (antibody) বা **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin) বলে। অ্যান্টিবডি থাকে ইম্যুনোগ্লোবিউলিনের (প্লাজমা প্রোটিন) অংশরূপে। অধিকাংশ ব্লাডগ্রুপ অ্যান্টিবডি হচ্ছে **ইম্যুনোগ্লোবিউলিন G** (Immunoglobulin G- IgG) বা **M** (IgM), কখনও কখনও **A** (IgA)। মানুষের রক্তের অ্যান্টিবডিও দুই প্রকার। যথা: anti-a, anti-b অ্যান্টিবডি। লোহিত কণিকায় A অ্যান্টিজেন যুক্ত রক্তের প্লাজমায় anti-b এবং B অ্যান্টিজেনযুক্ত রক্তের প্লাজমায় anti-a অ্যান্টিবডি থাকে। লোহিত কণিকায় A এবং B উভয় অ্যান্টিজেন থাকলে কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না। লোহিত কণিকায় কোনো অ্যান্টিজেন না থাকলে anti-a এবং anti-b উভয় অ্যান্টিবডি থাকে।

CamScanner

কোনো রক্তগ্রুপের কণিকায় অ্যান্টিজেন এবং তার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যান্টিবডিযুক্ত প্লাজমার মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্তগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে। O গ্রুপ সকল গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে কিন্তু নিজ গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে না। তাই O গ্রুপকে **সর্বজনীন দাতা** (universal donor) বলে। AB গ্রুপ সব গ্রুপের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে কিন্তু নিজ গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপকে দান করতে পারে না। তাই AB গ্রুপকে **সর্বজনীন গ্রহীতা** (universal recepient) বলে।

ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য নিচে ছকে উপস্থাপন করা হলো :

জিনোটাইপ	ফিনোটাইপ	অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি	রক্ত দিতে পারে	রক্ত নিতে পারে
I^AI^A বা I^AI^O	গ্রুপ- A (23%)	A	anti-b	A, AB	A, O
I^BI^B বা I^BI^O	গ্রুপ- B (35%)	B	anti- a	B, AB	B, O
I^AI^B	গ্রুপ- AB (8%)	A ও B	নেই	AB	A, B, AB, O
I^OI^O	গ্রুপ- O (34%)	নেই	anti- a, anti-b	A, B, AB, O	O

[অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে অধ্যায়-১০ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

ABO রক্ত গ্রুপের বংশগতি

বার্নস্টেইন (Bernstein, 1925) প্রস্তাব করেন যে, মানুষের ABO রক্তগ্রুপ (A, B, AB এবং O) সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত তিনটি অ্যালিলোমর্ফিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোজোমে জিনের এরূপ অবস্থাকে **মালটিপল অ্যালিল** (multiple allele) বলে। এই জিনকে I (রক্তগ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিন isoagglutinogen অনুসারে) অথবা L (রক্তগ্রুপ আবিষ্কারক Landsteiner নাম অনুসারে) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। I জিনের তিনটি অ্যালিল আছে, যেমন– I^A, I^B এবং I^O। এদের মধ্যে I^A অ্যালিল লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন-A এবং I^B অ্যালিল অ্যান্টিজেন -B সৃষ্টি করে। কিন্তু I^O অ্যালিল কোনো অ্যান্টিজেন সৃষ্টি করে না। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, I^A ও I^B পরস্পর সহপ্রকটতা (codominance) প্রদর্শন করে এবং I^A ও I^B উভয়ই I^O অ্যালিলের উপর প্রকট। অর্থাৎ $I^A = I^B > I^O$।

ABO রক্ত গ্রুপে জিনের তিনটি অ্যালিল উপস্থিতি থাকলেও কোন ব্যক্তিতে যেকোনো দুটি উপস্থিত থাকতে পারে। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, এই জিন তিনটির লোকাস ৯নং ক্রোমোজোমের লম্বা বাহুতে (q arm) অবস্থিত। মানুষ ডিপ্লয়েড হওয়ায় প্রত্যেকের একজোড়া করে জিন থাকবে ফলে ছয়টি জিনোটাইপ তৈরি হবে। অ্যালিলগুলো দ্বারা সম্ভাব্য ছয় ধরনের জিনোটাইপ চার ধরনের ফিনোটাইপ বা রক্তগ্রুপ A, B, AB ও O উৎপন্ন করে (উপরের ছকে উল্লেখ করা হয়েছে)।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ABO রক্ত শ্রেণিগুলোর প্রকৃতি মানুষের পপুলেশন শুধু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে না, রক্ত শ্রেণিগুলোর পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের প্রকৃতি অনুসারে কোনো দম্পতি কেমন সন্তান জন্ম দিতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। সে কারণে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক নিরসনেরও পিতামাতা ও সন্তানের রক্ত প্রকৃতি বিচার্য হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষের পপুলেশনে এমন 'O' শ্রেণির রক্তের সন্ধান পাওয়া যায় যে ক্ষেত্রে 'O' রক্তের মানুষটির জিনোটাইপ I^OI^O নয়। বিরল এই 'O' রক্তের মানুষদের **Bombay phenotype** বলে। পিতা ও মাতার মধ্যে কোনো একজন বোম্বে ফিনোটাইপের হলে সন্তান জন্মানোর ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়।

[বিশেষ তথ্য : **বম্বে ব্লাড গ্রুপ বা বম্বে ফিনোটাইপ** (Bombay Blood Group or Bombay Phenotype) : রক্তের শ্রেণি A, B, AB ও O ছাড়াও আরো একটি শ্রেণি আছে, যার নাম বম্বে ব্লাড গ্রুপ বা বম্বে ফিনোটাইপ। সর্বপ্রথম (১৯৫২) ভারতের বম্বে (মুম্বাই) শহরে এই রক্তশ্রেণির সন্ধান পাওয়া যায় বলে একে বম্বে ব্লাড গ্রুপ বা বম্বে ফিনোটাইপ বলা হয়। এই গ্রুপধারী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত সমগ্র পৃথিবীর মাত্র ০.০০০৪% জনসংখ্যার মানুষ এই গ্রুপধারীর। সাধারণত যে H অ্যান্টিজেন বা H substance থেকে A ও B উভয় অ্যান্টিজেনই তৈরি হয়, এই বম্বে ব্লাড গ্রুপ-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির এই H অ্যান্টিজেনটিই তৈরি হয় না। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রক্তের জিনোটাইপ A বা B বা AB রক্তশ্রেণির মতো হলেও কার্যগতভাবে তার রক্তশ্রেণি হয় O। মানবদেহের রক্তে H অ্যান্টিজেন বা H substance বর্তমান, যা প্রকৃতপক্ষে A ও B অ্যান্টিজেনের পূর্বসূরী, অর্থাৎ H অ্যান্টিজেনের উপর A ও B অ্যান্টিজেনের উৎপত্তি নির্ভরশীল। H জিন দ্বারা H অ্যান্টিজেনের সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। H জিনের পরিব্যক্তি (mutation) ঘটলে তথা পরিব্যক্ত প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (h) দুটি হোমোজাইগাস (hh) অবস্থায় থাকলে H অ্যান্টিজেন সংশ্লেষ ব্যাহত হয়। ফলে A ও B অ্যান্টিজেন উৎপন্ন হয় না এবং জিনোটাইপ I^OI^O না হওয়া সত্ত্বেও কার্যগত রক্তশ্রেণি হয় O।]

রক্ত গ্রুপ আবিষ্কারের অবদান রাখায় ল্যান্ডস্টেইনার 1930 সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। কোনো রক্তগ্রুপের কণিকায় অ্যান্টিজেন এবং তার সঙ্গে অসামঞ্জস্য পূর্ণ অ্যান্টিবডিযুক্ত প্লাজমার মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলে লোহিত রক্তকণিকাগুলো জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্তগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত রক্তের বিক্রিয়া।

দাতা ↓ / গ্রহীতা →	O	A	B	AB
O	–	+	+	+
A	+	–	++	+
B	+	++	–	+
AB	+	+	+	–

('–' = কোনো বিক্রিয়া ঘটে না, '+' সামান্য বিক্রিয়া ঘটে, ++ = সাংঘাতিক বিক্রিয়া ঘটে।)

CamScanner

দাতার সিরামের অ্যান্টিবডির প্রভাবে গ্রহীতার রক্তে যে সামান্য (+) বিক্রিয়া ঘটে তা ক্ষতিকর নয়। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তের আদান-প্রদান নিরাপদ। বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত একই গ্রুপের রক্ত পরস্পর মিলিয়ে নিয়ে (ক্রস ম্যাচিং) আদান-প্রদান করা হয়। কাজেই রক্ত সঞ্চালনের জন্য রক্তের গ্রুপ জানা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া ফরেনসিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে, সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ে এবং জাতিতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য রক্তের গ্রুপ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সার্বজনীন দাতা	সার্বজনীন গ্রহীতা
১। রক্ত দানে সামর্থ্য	সব ব্লাড গ্রুপভুক্তকে।	কেবল নিজ ব্লাড গ্রুপভুক্তকে।
২। রক্ত গ্রহণে সামর্থ্য	কেবল নিজ ব্লাড গ্রুপভুক্ত থেকে।	সব ব্লাড গ্রুপভুক্ত দাতা থেকে।
৩। অ্যান্টিজেন	নেই।	A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থেকে।
৪। অ্যান্টিবডি	দু'রকম থাকে। যথা– a ও b।	নেই।
৫। কোন ব্লাড গ্রুপ	O ব্লাড গ্রুপ।	AB ব্লাড গ্রুপ।

Rh ফ্যাক্টর (Rh Factor)

রেসাস বানরের (*Macaca mulatta*) রক্ত গিনিপিগের দেহে প্রবেশ করালে এক ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। উক্ত অ্যান্টিবডিযুক্ত রক্ত পুনরায় রেসাস বানরের দেহে প্রবেশ করালে বানরগুলো মারা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রেসাস বানরের রক্তে এক ধরনের অ্যান্টিজেন আছে, ওই অ্যান্টিজেনকে রেসাস বানরের নাম অনুসারে **রেসাস অ্যান্টিজেন** বা **রেসাস ফ্যাক্টর** বা **Rh ফ্যাক্টর** বলে। 1940 সালে **Karl Landsteiner** এবং **A.S. Wiener** সর্বপ্রথম এই অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন।

গিনিপিগের দেহে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি মানুষের রক্তের সঙ্গে মেশালে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষের লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে যায় এবং কিছু মানুষের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধে না। যেসব মানুষের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধে তাদের Rh পজিটিভ (**Rh$^+$ ve**) এবং যেসব মানুষের লোহিত কণিকা জমাট বাঁধে না তাদের Rh নেগেটিভ (**Rh$^-$ ve**) বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য, Rh পজিটিভ রক্ত Rh নেগেটিভ রক্তের ওপর প্রকট। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শ্বেতকায় ব্যক্তিদের প্রায় ৮৫% এবং ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান ও আফ্রিকায় ৯৫% ব্যক্তির লোহিত কণিকায় এ জাতীয় অ্যান্টিজেন (Rh ফ্যাক্টর) রয়েছে।

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে Rh ব্লাড গ্রুপ (Rh blood group) বলে। Rh ফ্যাক্টরবিশিষ্ট রক্তকে Rh$^+$ ve (**Rh** পজিটিভ) এবং Rh ফ্যাক্টরবিহীন রক্তকে Rh$^-$ ve (**Rh** নেগেটিভ) রক্ত বলে। অন্যান্য রক্ত গ্রুপের সাথে সমন্বয় করে Rh ফ্যাক্টর প্রকাশ করা হয়। যেমন– A+ve, A-ve, B+ve, B-ve, O+ve, AB+ve ইত্যাদি।

রেসাস ফ্যাক্টর অনুসারে দাতার রক্তে যে অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে মিলিয়ে এমনভাবে গ্রহীতা নির্বাচন করতে হবে যেন তার রক্তে দাতার অ্যান্টিজেনের সাথে সম্পর্কিত অ্যান্টিবডিটি না থাকে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন গ্রুপ কাকে রক্ত দিতে পারবে বা পারবে না, তার একটা ছক নিচে দেওয়া হলো–

বিভিন্ন ব্লাড গ্রুপের বৈশিষ্ট্য		
A+	A+ AB+	A+ A– O+ O–
O+	O+ A+ B+ AB+	O+ O–
B+	B+ AB+	B+ B– O+ O–
AB+	AB+	সব গ্রুপকে
A–	A+ A– AB+ AB–	A– O–
O–	সব গ্রুপকে	O–
B–	B+ B– AB+ AB–	B– O–
AB–	AB+ AB–	AB– A– B– O–

Rh ফ্যাক্টর-এর জিনগত ব্যাখ্যা

বিজ্ঞানী Fisher মতপ্রকাশ করেন যে, Rh ফ্যাক্টর মূলত ৬টি অ্যান্টিজেনের সমষ্টি। এদের ৩ জোড়ায় ভাগ করা যায়, যেমন– C, c; D, d ও E, e। এদের মধ্যে C, D, E হচ্ছে মেন্ডেলীয় প্রকট (Mendelian dominant) এবং c, d, e হচ্ছে মেন্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন (Mendelian recessive)। মানুষের লোহিত কণিকায় একসঙ্গে ৩টি অ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান কখনও একসাথে থাকে না, যেমন– CDE, CDe, cDE এমন সন্নিবেশ সম্ভব, কিন্তু CcD ও CDd অসম্ভব। মেন্ডেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন (CDE) যে রক্তে থাকে তাকে **Rh$^+$ ve** রক্ত বলে। আবার D ব্যতিরেকে C বা E থাকতে পারে না, তাই প্রতিটি ধনাত্মক Rh (Rh$^+$)-এ D-এর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে, যে রক্তে মেন্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন অ্যান্টিজেন (cde) থাকে তাকে **Rh$^-$ ve** রক্ত বলে। পরবর্তীকালে **Fisher-Race**,

CamScanner

জিন কমপ্লেক্স তত্ত্ব উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বানুসারে অন্তত তিন জোড়া অ্যালিল (Cc, Dd ও Ee) Rh রক্তশ্রেণি নিয়ন্ত্রণ করে। মূলত D জিনটি Rh^+ রক্ত সৃষ্টির জন্য দায়ী। Fisher-Race তত্ত্বানুসারে Rh^+ রক্তের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনের সন্নিবেশ হবে- CDE, CDe, cDE, cDe এবং Rh^- রক্তের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনের সন্নিবেশ হবে- CdE, Cde, cdE, cde।

Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট জটিলতা (Problems due to Rh Factor)

১. রক্ত সঞ্চারণে জটিলতা (Complexity in Blood Transfusion) : Rh^- (Rh নেগেটিভ) লোকের দেহে Rh^+ (Rh পজিটিভ) রক্ত প্রবেশ করানো হলে গ্রহীতার রক্তের প্লাজমায় দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই Rh-অ্যান্টিবডি (অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর) তৈরি হয়। পরে যদি কোনো সময় ওই একই গ্রহীতার (Rh^-) দেহে Rh^+ রক্ত প্রবেশ করানো হয় তবে Rh-অ্যান্টিবডি প্রভাবে গৃহীত রক্তের (দাতার) লোহিত কণিকাগুলো গ্রহীতার দেহে জমাট বেঁধে যায় এবং রক্তগ্রহীতার মৃত্যু ঘটে। তবে একবার রক্তগ্রহণের পর যদি গ্রহীতা (Rh^-) আর ঐ রক্ত (Rh^+) গ্রহণ না করে তাহলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত Rh-অ্যান্টিবডি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়। কোনো ব্যক্তির দেহে রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতা-গ্রহীতা উভয়ের Rh ফ্যাক্টর পরীক্ষা করে দেখা বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের রক্তই Rh^+ কিংবা Rh^- হওয়া উচিত, অবশ্য Rh^- রক্ত Rh^+ রক্তের কোনো ক্ষতি করে না। এ কারণে সঙ্কটকালে রক্ত সঞ্চারণের প্রয়োজন হলে এবং দাতা ও গ্রহীতার রক্তগ্রুপ জানা না থাকলে গ্রহীতার দেহে 'O' গ্রুপের Rh- রক্ত সঞ্চারণ করাই শ্রেয়।

২. গর্ভধারণজনিত জটিলতা (Complexity in Pregnancy): Rh^+ (Rh পজিটিভ) ফ্যাক্টরের জন্য দায়ী জিন প্রকট হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাই Rh^- (Rh নেগেটিভ) প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। মাতা যদি Rh^- এবং পিতা যদি Rh^+ হয় তাহলে তাদের প্রথম সন্তান Rh^+ হবে। এ শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের রক্তে Rh-অ্যান্টিবডি (**অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর**) সৃষ্টি হবে। প্রথমবার গর্ভধারণে যথেষ্ট মাত্রায় Rh-অ্যান্টিবডি উৎপন্ন না হওয়ায় শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না এবং এ শিশু জীবিত থাকে। মাতার এ অ্যান্টিবডি পরবর্তী গর্ভস্থ সন্তানের (বিশেষ করে দ্বিতীয় সন্তান) দেহে অমরার মাধ্যমে প্রবেশ করে ভ্রূণের লোহিত কণিকা নষ্ট করে দেয়। সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে অধিক লোহিত কণিকার হিমোলাইসিসজনিত এই রক্তস্বল্পতার রোগকে **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস** (erythroblastosis fetalis) বা **হিমোলাইটিক ডিজিস অব নিউবর্ন** (Haemolytic Disease of the New born-HDN) বা **ইকটেরাস গ্র্যাভিস নিওনেটোরাম** (icterus gravis neonatorum) নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কণিকাগুলো দ্বারা যকৃতের রক্তবাহিকাগুলো অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং রক্তে প্রচুর পরিমাণ পিত্ত অনুপ্রবেশ করে, ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় ও **জন্ডিস** (jaundice) এবং **তীব্র ইডিমা** (edema) দেখা দেয়। এ রোগ অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করলে জন্মের পূর্বে অর্থাৎ শিশুটি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মারা যায়, তখন সেই অবস্থাকে **হাইড্রপস ফিটালিস** (hydrops fetalis) বলা হয় অথবা জন্মের কয়েক ঘণ্টা হতে কয়েক দিনের মধ্যে নবজাতকের মৃত্যু ঘটতে পারে। হাইড্রপস ফিটালিস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য জন্ডিস এবং তীব্র ইডিমা। Rh^+ ও Rh^- রক্তের গ্রুপের পিতামাতার সন্তানাদির রক্তের গ্রুপের বিশ্লেষণের ছক নিম্নরূপ:

মাতা	পিতা	সন্তানাদি
Rh^+ / Rh^+	Rh^+ / Rh^+	১০০% Rh^+
Rh^- / Rh^-	Rh^+ / Rh^+	১০০% Rh^+ / Rh^-
Rh^- / Rh^-	Rh^- / Rh^-	১০০% Rh^- / Rh^-
Rh^+ / Rh^-	Rh^+ / Rh^+	৫০% Rh^+ / Rh^+ ৫০% Rh^+ / Rh^-
Rh^+ / Rh^-	Rh^+ / Rh^-	৫০% Rh^+ / Rh^+ ২৫% Rh^+ / Rh^- ২৫% Rh^+ / Rh^+
Rh^- / Rh^-	Rh^+ / Rh^-	৫০% Rh^+ / Rh^- ৫০% Rh^- / Rh^-

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে তাই বর ও কনের Rh ফ্যাক্টর পরীক্ষা করে দেখা দরকার। দম্পতিদের একই Rh ফ্যাক্টরভুক্ত (হয় Rh^+ নতুবা, Rh^-) হওয়া উচিত। তবে সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশে Rh^- বৈশিষ্ট্য দুর্লভ।

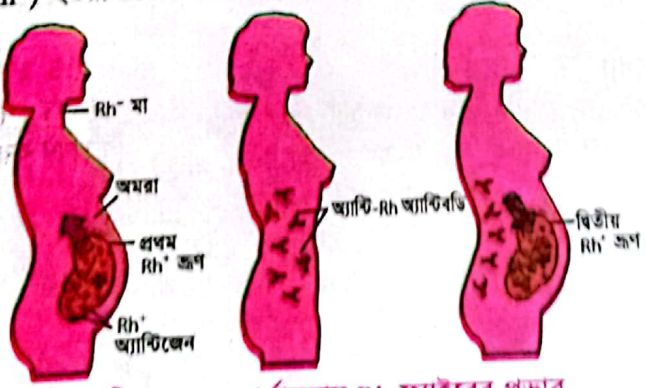

চিত্র ১১.৪ : গর্ভাবস্থায় Rh ফ্যাক্টরের প্রভাব

CamScanner

উল্লেখ্য শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রায় ৮৫% বা তার অধিক Rh^+ বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর ভারতীয় ও সিংহলীয়দের মধ্যে প্রায় ৯৫% বা তার অধিক Rh^+ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অপরপক্ষে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ককেশিয়ানদের ১৫% Rh^- বৈশিষ্ট্য বহন করে। তবে যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তারা হচ্ছে পাইরেনীজ-এর বাস্ক (২৫-৩৫%), আফ্রিকার বার্বার এবং সাইনাই-উপদ্বীপের বেদুইন (১৮-৩০%)। এছাড়া ভারত, শ্রীলংকা, চীন, জাপান ও আফ্রিকায় ৫% Rh^- বৈশিষ্ট্য বহন করে।

রেসাস ফ্যাক্টরজনিত জটিলতা প্রতিরোধের উপায় : তবে বর্তমানে অ্যান্টি-D অ্যান্টিরেসাস অ্যাগ্লুটিনিন আবিষ্কার হয়েছে যা Rh^- মাতার দেহে সন্তান জন্মাবার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করা হয়। তাছাড়া আক্রান্ত শিশুটির দেহ থেকে Rh^+ রক্ত ধীরে ধীরে বের করে নিতে হয় এবং একই সাথে Rh^- রক্ত (যাতে কোনোদিন Rh^+ রক্ত মেশেনি) প্রবেশ করাতে হয়। এইভাবে ধ্বংসের মুখে পড়া লোহিত কণিকা শিশুর দেহ থেকে অপসারিত হবে এবং স্বাভাবিক লোহিত কণিকা থেকে যাবে।

পিতা-মাতার ব্লাড গ্রুপের ভিত্তিতে সন্তানের (অপত্যের) সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ

পিতা-মাতার ফিনোটাইপ (ব্লাড গ্রুপ)	পিতা-মাতার জিনোটাইপ	সন্তানের জিনোটাইপ	সন্তানের ব্লাড গ্রুপ
A × A	$I^AI^A/I^AI^O \times I^AI^A/I^AI^O$	$I^AI^A/I^AI^O/I^OI^O$	A/O
B × B	$I^BI^B/I^BI^O \times I^BI^B/I^BI^O$	$I^BI^B/I^BI^O/I^OI^O$	B/O
O × O	$I^OI^O \times I^OI^O$	I^OI^O	O
A × B	$I^AI^A/I^AI^O \times I^BI^B/I^BI^O$	$I^AI^O/I^BI^O/I^AI^B/I^OI^O$	A/B/AB/O
A × AB	$I^AI^A/I^AI^O \times I^AI^B$	$I^AI^A/I^AI^O/I^BI^O/I^AI^B$	A/B/AB
A × O	$I^AI^A/I^AI^O \times I^OI^O$	I^AI^O/I^OI^O	A/O
B × AB	$I^BI^B/I^BI^O \times I^AI^B$	$I^BI^B/I^AI^B/I^BI^O/I^AI^O$	A/B/AB
B × O	$I^BI^B/I^BI^O \times I^OI^O$	I^BI^O/I^OI^O	B/O
AB × O	$I^AI^B \times I^OI^O$	$I^AI^O \times I^BI^O$	A/B
AB × AB	$I^AI^B \times I^AI^B$	$I^AI^A/I^BI^B/I^AI^B$	A/B/AB

[**প্রাসঙ্গিক তথ্য :** A ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন পুরুষের সাথে B ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন মহিলার বিবাহ হলে তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য ব্লাডগ্রুপ কি হবে?

সমাধান :

পিতামাতা (P_1): ফিনোটাইপ ⟶ ♂ A ব্লাড গ্রুপযুক্ত × ♀ B ব্লাড গ্রুপযুক্ত

জিনোটাইপ ⟶ I^AI^A/I^AI^O I^BI^B/I^BI^O

গ্যামিট ⟶ I^A I^O I^B I^O

F_1 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডে দেখানো হলো :

♀ \ ♂	I^A	I^O
I^B	I^AI^B (AB)	I^BI^O (B)
I^O	I^AI^O (A)	I^OI^O (O)

সন্তানদের সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ ২৫% A, ২৫% B, ২৫% AB এবং ২৫% O।]

❑ **কাজ :** (i) রক্তদান করলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। বিশ্ব রক্তদান দিবসে (১৪ জুন) এ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক একটি তথ্যবহুল পোস্টার তৈরি করে শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় কলেজ বোর্ডে স্থাপন কর। (ii) রক্তের গ্রুপের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। (iii) গ্রুপ না মিলিয়ে রক্ত নিলে গ্রহীতা মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে– বিশ্লেষণ কর। (iv) রক্তের ধনাত্মক টাইপ অথবা ঋণাত্মক টাইপ বিষয়টি বিবাহ সম্পর্কে স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখে– আলোচনা কর। (v) রক্তের গ্রুপ AB এবং O এর মধ্যে ক্রস ঘটালে তাদের সন্তানদের রক্তগ্রুপ বাবা-মায়ের চেয়ে ভিন্ন হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। (vi) A এবং B রক্তের গ্রুপের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ক্রস ঘটালে কত অনুপাতে AB এবং O রক্তগ্রুপ ধারী সন্তান হবে তা চেকার বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন কর। (vii) A ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন পুরুষের সাথে B ব্লাড গ্রুপযুক্ত একজন মহিলার বিবাহ হলে তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ কী হবে? ব্যাখ্যা করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও। (viii) একজন A ব্লাড গ্রুপযুক্ত মাতার সন্তানের ব্লাড গ্রুপ AB হলে সন্তানটির পিতার সম্ভাব্য ব্লাড গ্রুপ কী? ব্যাখ্যা করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও।

CamScanner

১১.৮ বিবর্তন তত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা (Concept of Theory of Evolution)

পৃথিবীতে কোনো কিছুই সুস্থিত (stable) নয়। অতীতকালে মানুষের ধারণা ছিল, সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার ও আয়তন ছিল তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের কোনো পার্থক্য নেই। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) প্রমাণ করেন যে, জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বর্তমান এবং একটি শ্রেণির জীব অপর একটি শ্রেণির জীব থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত। জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভব হয়ে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। তাই বিবর্তন হলো একটি মন্থর ও গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীব থেকে জটিল জীবের উদ্ভব হয়েছে। বিখ্যাত বিবর্তনবিদ চার্লস রবার্ট ডারউইন বিবর্তনকে **পরিবর্তনসহ উত্তরণ** (descent with modification) বলে উল্লেখ করেছেন। Evolution শব্দটি বাস্তবিক পক্ষে ল্যাটিন শব্দ, *e* = from; *volvere* = to roll থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো **বিকশিত হওয়া** (unrolling) বা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হওয়া। **হার্বার্ট স্পেন্সার** (Herbert Spencer, 1952) সর্বপ্রথম Evolution শব্দটি ব্যবহার করেন।

বিবর্তন (Evolution) : কোনো জীবের সরল অবস্থা থেকে জটিলতার দিকে পর্যায়ক্রমিক অতি ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনকে **বিবর্তন বা অভিব্যক্তি** বলে। বিবর্তনের ফলে অধিকতর জটিল জীবের সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ ঘটে।

জৈব বিবর্তন (Organic evolution) : জীবে ধারাবাহিক ও বংশানুসরণযোগ্য যে জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ উদ্বংশীয় জীব থেকে জিনগতভাবে ভিন্ন প্রকৃতির নতুন প্রকারের জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে জৈব বা জৈবিক বিবর্তন (organic or biological evolution) বলে।

বিবর্তনের ধারণা (Concept of Evolution) : বিবর্তন সম্বন্ধীয় যেকোনো আলোচনায় **চার্লস ডারউইন** (Charles Darwin) এর নাম সবার আগে আসে। বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইন যে মতবাদ প্রদান করেছেন তা চিন্তাবিদদের এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, ডারউইনের মতবাদ ও বিবর্তন এ দুটো প্রায় একীভূত হয়ে যায়। বিবর্তন সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল অনেক প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ দশকে গ্রিক দার্শনিক **অ্যানাক্সিম্যান্ডার** (Aneximander) এর ধারণা ছিল মাছ থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম দশকে **জেনোফেনিস** (Xenophanes) জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, স্থলে যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা একদিন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। গ্রিক দার্শনিক **এমপেডোক্লিস** (Empedocles, 495-435 B.C) এর ধারণা ছিল, মাটি বা অজৈব পদার্থ থেকে প্রথম উদ্ভিদ ও পরে প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। এমপেডোক্লিসকে **বিবর্তনের জনক** (father of evolution) বলে অভিহিত করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ দশকে সর্বকালের বরেণ্য **অ্যারিস্টটল** (Aristotle) এর ধারণা ছিল যে, অজৈব বস্তুর রূপান্তরের মাধ্যমে পৃথিবীতে জৈব বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে। তাঁর মতে, প্রকৃতি নির্ভুল নীতিতে প্রতিটি জীবের পরিবর্তন সাধন করে থাকে।

Aristotle(384-322 B.C)

কালক্রমে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়া পরম্পরায় জটিল জৈবিক পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো সরলতর সজীব পদার্থ **প্রোটোপ্লাজম** তথা জীবকোষ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন জটিল অজৈব এবং জৈব পদার্থের সংযুক্তির ফলে একদিন যে প্রোটোপ্লাজম আত্মপ্রকাশ করেছিল সে আদি প্রোটোপ্লাজমই বিভিন্ন পরিবেশে পরিবর্তন হতে হতে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে রূপ নিয়েছে। প্রথমদিকে পৃথিবীর উত্তাপ ছিল অত্যন্ত বেশি। ঠাণ্ডা পরিবেশের প্রভাবে পৃথিবী ক্রমশ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে বিভিন্ন পরমাণু যুক্ত হয়ে স্থায়ী যৌগিক পদার্থ গঠনের মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হতে থাকে। সব পরমাণু কারও না কারও সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ গঠন করে ফেলে। এভাবে পৃথিবীর রাসায়নিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

বিবর্তনের প্রকারভেদ (Types of evolution)

১। **মাইক্রো বিবর্তন (Microevolution) :** পরিব্যক্তি (mutation), প্রকরণ (variation) ইত্যাদির ফলে জিনে সংঘটিত ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলো এই প্রকার বিবর্তন সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন জাত (race), ভ্যারাইটি বা উপপ্রজাতির (variety or sub species) সৃষ্টি হয়।

২। **ম্যাক্রো বিবর্তন (Macroevolution) :** এই প্রকার বিবর্তনের ফলে উপপ্রজাতি থেকে প্রজাতির উৎপত্তি হয়।

৩। **মেগা বিবর্তন (Megaevolution) :** পরিব্যক্তির ফলে অনেকে সময় ধরে, বৃহৎ পরিসরে সংঘটিত পরিবর্তন, যার ফলে মেজর ট্যাক্সাগুলো (গোত্র, বর্গ, শ্রেণি ইত্যাদির) সৃষ্টি হয়।

৪। **প্রোগ্রেসিভ বা অগ্রগামী বিবর্তন (Progressive evolution) :** এই প্রকার বিবর্তনে সরল গঠন থেকে জটিল ও উন্নত গঠন সৃষ্টি হয়। যেমন– মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি ইত্যাদির সৃষ্টি।

৫। **রেট্রোগ্রেসিভ বা অবনয়নশীল বিবর্তন (Retrogressive evolution) :** এই প্রকার বিবর্তনে বিভিন্ন জটিল গঠন থেকে অপেক্ষাকৃত সরল গঠন সৃষ্টি হয়। যেমন– লুপ্তপ্রায় অঙ্গের সৃষ্টি।

CamScanner

৬। অভিসারী বিবর্তন (Convergent evolution) : এই প্রকার বিবর্তনে একই পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে ভিন্ন দুটি জীবদেহে বাহ্যিক গঠন ও কার্যগতভাবে একই প্রকার অঙ্গের সৃষ্টি হয়। যেমন– মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছের হুল।

৭। অপসারী বিবর্তন (Divergent evolution) : এই প্রকার বিবর্তনে বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই দুটি জীবদেহে বাহ্যিক গঠন ও কার্যগতভাবে ভিন্ন প্রকার অঙ্গের সৃষ্টি হয়। যেমন– পাখির ডানা ও মানুষের হাত।

৮। সহবিবর্তন (Coevolution) : বাস্তুতান্ত্রিক সম্বন্ধযুক্ত একাধিক প্রজাতির একটির বিবর্তন এবং অপর প্রজাতি বা প্রজাতিগুলোর বিবর্তন ঘটলে তাকে সহবিবর্তন বলা হয়। যেমন– পোষকের (host) বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্যাথোজেনের (pathogen) বিবর্তন।

১১.৯ বিবর্তনের মতবাদসমূহ (Theories of Evolution)

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সরলতম জীব থেকে জটিল জীবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইহাই বিবর্তনের মূল বক্তব্য। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেক তথ্য ও প্রমাণাদি আছে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় কীভাবে এই বিবর্তন ঘটেছে, তা কঠিন ও বিতর্কিত প্রশ্ন। বিবর্তন প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা বিবর্তন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– Robert Hook (1635-1703), Jon Ray (1627-1705), Buffon (1707-1788), Lamarck (1744-1829), Charles Darwin (1809-1882), August Weismann (1834-1914), Hugo de Vries (1848-1935), J.B.S. Haldane (1892-1964) এবং Alexander Oparin (1894-1980) প্রমুখ।

বিবর্তনের আধুনিক মতবাদসমূহ :

- ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কের **'অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ'** (Theory of inheritance of acquired characters)
- ডারউইনিজম বা ডারউইনের **'প্রাকৃতিক নির্বাচন'** মতবাদ (Theory of natural selection)
- **'নিওডারউইনিজম'** বা আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ (Modern synthesis theory of Neodarwinism)
- অগাস্ট ভাইজম্যানের **'জার্মপ্লাজম'** মতবাদ (Germplasm theory of August Weismann) এবং
- ভ্রিসের **'পরিব্যক্তি'** মতবাদ (Mutation theory of de Vries)।

ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কিজম বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ (Lamarckism or Theory of Inheritance of Acquired Characters)

J.B. Lamarck
(1744-1829)

ল্যামার্ক একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ছিল **জ্যাঁ ব্যাপাটিস্ট অ্যান্টিয়নি দ্য মনোট ল্যামার্ক** (Jean Baptiste Antiony De Monet Lamarck)। তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন। 1744 খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। এই ফরাসি বিজ্ঞানী 1809 খ্রিষ্টাব্দে অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর মতবাদ **ফিলোসফিক জুলোজিক** (Philosophic Zoologic) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি দুটি সূত্রের অবতারণা করেন এবং পরে ইনভার্টিব্রেট জুলজি' নামক পুস্তকে আরও দুটি মতবাদ সংযোজন করেন। তাঁর এই সূত্রগুলো একত্রে **অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ** (Theory of inheritance of acquired characters) নামেও খ্যাত।

অর্থাৎ কোনো জীব উহার জীবনে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই মতবাদ ল্যামার্কিজম নামে খ্যাত। ল্যামার্কই প্রথম **বায়োলোজি** (Biology) শব্দটি প্রবর্তন করেন এবং প্রাণিজগৎকে **অমেরুদণ্ডী** ও **মেরুদণ্ডী** এ দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেন। তিনি 1829 খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ল্যামার্ক-এর সূত্রসমূহ

1960 সালে বিজ্ঞানী ডডসন ল্যামার্ক মতবাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন এবং চারটি সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করেন।

১। প্রথম সূত্র- অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি জীবের আকার বৃদ্ধি করতে চায় : প্রতিটি জীবের একটি নিজস্ব অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি আছে এবং সেই প্রাণশক্তি ইহার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির আকার-আকৃতি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রয়াস পায়। এই প্রয়াস পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা : সূত্রে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি জীব তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারে। তবুও জীব মাত্রই পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। একই প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ দুটি ভিন্ন পরিবেশে থাকলে তাদের বৃদ্ধি ভিন্নতর হয় অর্থাৎ আকৃতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জীবের এই দৈহিক বৃদ্ধি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

CamScanner

২। দ্বিতীয় সূত্র- পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন : জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং তা মেটানোর জন্য যে তাগিদ জীব অনুভব করে তার ফলে দেহে কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি বা নতুন অঙ্গের সংযোজন ঘটে (new organs results from new needs)। এই সংযোজন জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

ব্যাখ্যা : জীবনধারণের জন্য যে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয় তা মেটানোর জন্য জীব সক্রিয় প্রচেষ্টা করে তাহলে দেহের কোনো অঙ্গকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করতে পারে। এই বর্ধিত অঙ্গ জীবকে প্রতিকূল পরিবেশে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহযোগিতা করে।

যেমন– জিরাফের পূর্বপুরুষেরা আকারে ছোট ও শাকাসী প্রাণী ছিল। তাদের অগ্রপদ ও গ্রীবা বেশ ছোট ছিল। স্থলভাগে চারণযোগ্য ভূমির অভাব হলে জিরাফের পূর্বপুরুষরা গাছের পাতা ভক্ষণ করতে শুরু করে। এভাবে নিচের পাতা শেষ হয়ে যায় এবং উপরের কচিপাতা ভক্ষণের জন্য গ্রীবা উত্তোলন করে। গাছের শীর্ষের কচি পাতার নাগাল পাওয়ার জন্য ক্রমাগত গ্রীবা উত্তোলন ও প্রসারণের ফলে ইহা বৃদ্ধি পায় এবং বংশপরম্পরায় চলতে থাকায় গ্রীবা ও অগ্রপদ লম্বা হয়ে বর্তমান আকৃতি ধারণ করে। ল্যামার্কের মতে, ক্রমাগত সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান জিরাফের গ্রীবা ও অগ্রপদ দীর্ঘ হয়েছে।

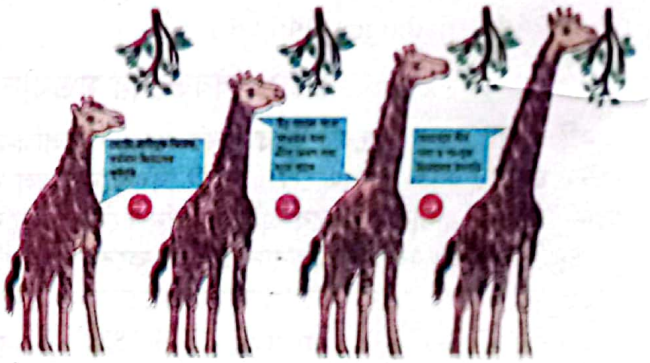

চিত্র ১১.৫ : জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার ল্যামার্কীয় ব্যাখ্যা

৩। তৃতীয় সূত্র- ব্যবহার ও অব্যবহার : জীবদেহের কোনো অঙ্গের উন্নয়ন ও কর্মক্ষমতা তার ব্যবহারের ওপর সরাসরি নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা : কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তা বৃহৎ, সুগঠিত ও কার্যক্ষম হতে পারে, আবার অব্যবহারের ফলে তা ক্রমশ ক্ষুদ্র বা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অঙ্গের ব্যবহার : ল্যামার্কের মতে জিরাফের পূর্বপুরুষের গ্রীবা বর্তমানে ঘোড়ার, গ্রীবার মতোই ছোট ছিল। কিন্তু আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে ঐ সকল প্রাণীদের লম্বা গাছের পাতা খাওয়ার জন্য গলা প্রসারিত করতে হতো। এভাবে বহু বংশধরে গলার অত্যধিক ব্যবহারের ফলে আধুনিক জিরাফের গলা লম্বা হয়েছে।

কর্মকার, নৌচালক, ব্যায়ামবিদ, কুস্তিগীর, মুষ্টিযোদ্ধা ইত্যাদি মানুষের পেশি প্রতিনিয়ত ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত সুগঠিত হয়। ল্যামার্ক উদাহরণ দিতে গিয়ে আরও বলেছেন যে, বালিহাঁস, পেলিকান, হাড়গিলা ইত্যাদি পাখি আদিকালে স্থলচর ছিল। খাদ্যের অভাব ঘটলে কিছু পাখি পানিতে আসে এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য পায়ের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পায়ের আঙুলের পাশ হতে চামড়া বৃদ্ধি পেয়ে লিপ্তপদ (webbed feet) বিশিষ্ট পাখির উদ্ভব ঘটায়।

অঙ্গের অব্যবহার : অব্যবহারের ফলে যে অঙ্গ ক্রমশ ক্ষুদ্র হয় বা অঙ্গের বিলুপ্তি ঘটে ল্যামার্ক তাও ব্যাখ্যা করেন। ল্যামার্কের মতে, সাপের একসময় পা ছিল। পরবর্তীতে সাপ বুকের ওপর ভর করে চলত ও সরু গর্তে বাস করতে শুরু করে। এই দুই অবস্থায় পায়ের কোনো ব্যবহার হয় না বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই সাপের পূর্বপুরুষেরা ধীরে ধীরে পায়ের ব্যবহার বর্জন করে। দীর্ঘদিন ধরে পায়ের অব্যবহারের ফলে পা একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তাঁর মতে, নিউজিল্যান্ডের কিউই পাখি ও আফ্রিকার উট পাখির ডানা দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহারের ফলে তা ক্রমশ ছোট ও এত দুর্বল হয়েছে যে ঐ সকল পাখি আর উড়তে পারে না।

মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে কক্কিক্সে রূপান্তরিত হয়েছে। গুহাবাসী প্রাণীরা অন্ধকারে বাস করে। এজন্য তাদের চোখ কোনো কাজে লাগে না। চোখের অব্যবহারের ফলে এদের চোখ থাকে না।

৪। চতুর্থ সূত্র- অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার : কোনো জীবের জীবনকালে অর্জিত গুণাবলি (বৈশিষ্ট্য) তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সংরক্ষিত হয়।

ব্যাখ্যা : কোনো জীবের জীবনকালে যে নতুন গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় তা সেই জীবের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই অর্জিত গুণাবলি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় বলে কয়েক পুরুষের ব্যবধানে পূর্বপুরুষ ও দূরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ পার্থক্যের কারণেই প্রকরণ দেখা দেয় এবং প্রকরণ থেকে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কলাকৌশলই হচ্ছে জৈব অভিব্যক্তির মূলমন্ত্র।

CamScanner

ল্যামার্কিজমের সমালোচনা (Criticism of Lamarckism)

ল্যামার্কিজম অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ–

- August Weismann পর পর ২২ প্রজন্ম (generation) ধরে পুরুষ ও স্ত্রী ইঁদুরের লেজ কেটে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, জন্মসূত্রে কোনো লেজবিহীন ইঁদুর জন্মায়নি। এ থেকে বলা যায়, অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশগত নয়।
- কর্মকার, দৌড়বিদ, শ্রমিক, কুস্তিগীর ইত্যাদির পেশি শক্তিশালী ও সুগঠিত হলেও তা তাদের পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয় না।
- শিরা ও ধমনি ক্রমাগত ব্যবহৃত হলেও এদের আকার ও আয়তন কখনো বৃদ্ধি পায় না। এ থেকে বলা যায় ল্যামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার তত্ত্বটি সত্য নয়।
- বিজ্ঞানী পেইন (Payne) বহু প্রজন্ম ধরে (69 generation) ফলের মাছিকে (*Drosophila*) অন্ধকারে রেখেও জন্মসূত্রে কোনো অন্ধ মাছি পাননি।
- মুসলমান ও ইহুদি বালকদের লিঙ্গের অগ্রভাগের পিপিউস নামক চামড়া কেটে ফেলা হয়, কিন্তু এটি জন্মসূত্রে কোনো বংশে সঞ্চারিত হয় না।

ল্যামার্কের মতবাদ অবৈজ্ঞানিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলে প্রমাণিত হলেও এটিই বিবর্তন সম্বন্ধীয় প্রথম মতবাদ। এ মতবাদ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন পরিবেশে অনেক জীবের অভিযোজনের চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করে। তবে এ মতবাদের সপক্ষে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি না থাকায় হাক্সলে, পাভলভ, লয়েল, ভাইজম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানী এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। বর্তমানকালে জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্জিত গুণাবলি কখনো বংশগত হয় না।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম (Darwinism)

ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন বিবর্তনের ওপর যে মতবাদ ব্যক্ত করেন, তা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করে। তিনি 1831 খ্রিষ্টাব্দে ১৭ ডিসেম্বর **'এইচ. এম. এস. বিগল** (Her Majestic Service Beagle)' নামক সমুদ্র জাহাজে বিশ্বভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবে চাকরির সুবাদে এই জাহাজে করে পাঁচ বছরের বেশি সময় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জীবজন্তু সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। এ জাহাজে চড়ে তিনি নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিসাস, আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ, গ্যালোপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের ডেভেনপোর্ট (Devenport) থেকে যাত্রা শুরু করেন।

এই সময়ে বিবর্তন সম্পর্কে তার ধারণা জন্মে এবং তা বিখ্যাত গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করেন। 1859 খ্রিষ্টাব্দে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতবাদই **'ডারউইনিজম'** (Darwinism) নামে খ্যাত। অনেকে গ্রন্থটিকে বিবর্তনের বাইবেল আখ্যা দেন। ডারউইন 1809 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1836 খ্রিষ্টাব্দে বিবর্তন ও প্রাণীদের সাদৃশ্য নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর ধরে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার ফলে প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ব তোলপাড় করা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি 1882 খ্রিষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে (Westminster Abbey) নিউটনের কবরের নিকট তাঁকে সমাহিত করা হয়। প্রকৃতিকে ডারউইন তাঁর মতবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি তার নিজস্ব নির্বাচন ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপযুক্ত জীবগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচন করে এবং অনুপযুক্ত জীবগুলোকে নির্মূল করে দেয়। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা বা না থাকা প্রকৃতির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নির্বাচনই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মাধ্যমে অভিব্যক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখে। তাই ডারউইনের মতবাদ **প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব** (Theory of Natural Selection) নামে পরিচিত। তিনি দেখতে পান যে, তাঁর সমসাময়িক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী **এ. আর. ওয়ালেস** (A.R. Wallace, 1823-1913) ইতিমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর ন্যায় *প্রাকৃতিক নির্বাচন* সংক্রান্ত অভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেন। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ **ডারউইন-ওয়ালেস** (Darwin-Wallace) যৌথ মতবাদ হিসেবে অভিহিত। ডারউইনের *প্রাকৃতিক নির্বাচন* মতবাদ ৬টি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা– (১) বংশবৃদ্ধির উচ্চহার; (২) খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা; (৩) জীবন সংগ্রাম; (৪) প্রকরণ বা পরিবৃত্তি; (৫) যোগ্যতমের বিজয় এবং (৬) প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি।

H.M.S. BEAGLE

Darwin (1809-1882)

CamScanner

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহের ছক

পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। বংশবৃদ্ধির উচ্চহার ২। খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা	জীবন সংগ্রাম (অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম)
৩। জীবন সংগ্রাম ৪। প্রকরণ বা পরিবৃত্তি	যোগ্যতমের জয় (প্রাকৃতিক নির্বাচন)
৫। যোগ্যতমের জয় ৬। প্রাকৃতিক নির্বাচন	নতুন প্রজাতি সৃষ্টি (জৈবিক বিবর্তন)

ডারউইন-এর মতবাদের ব্যাখ্যা (Explanation of Darwin Theory)

১। বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of Reproduction) : প্রতিটি জীব প্রজননের সময় যে অগণিত সংখ্যায় সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে তা ডারউইনের মনে দাগ কাটে। কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে জনন হারকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। একটি স্ত্রী **স্যালমন মাছ** (Salmon fish) একটি ঋতুতে প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ ডিম পাড়ে। একটি **ঝিনুক** প্রায় ১১ কোটি ৪০ লাখ ডিম ছাড়ে। এককোষী প্রাণী **প্যারামেসিয়াম** (*Paramecium*) বছরে ৬০০ বার প্রজনন ঘটাতে সক্ষম। এসব প্রাণীর যেকোনো একটির সব বংশধর বেঁচে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী ভরে যেত। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সন্তান উৎপন্ন করাই প্রকৃতির ধর্ম।

২। খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food and space) : বংশবৃদ্ধির উচ্চ হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য ও বাসস্থানের সংকুলান করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে স্থানের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় হওয়ায় খাদ্য উৎপাদনের হার কখনোই বংশ বৃদ্ধির হারকে ছুঁতে পারে না। জীবের বংশ বৃদ্ধি ঘটে জ্যামিতিক হারে; কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে। ফলে অধিক সন্তান-সন্ততির জন্ম হলেও প্রকৃতির নিয়মে বাসস্থান ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে এদের অধিকাংশই অচিরে বিলীন হয়ে যায়।

৩। জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) : প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য অকুণ্ঠ প্রয়াস থাকে। সুতরাং প্রজননের ফলে সৃষ্ট অগণিত অপত্য জীব সীমিত খাদ্য ও বাসস্থানের সম্মুখীন হয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে ও প্রত্যেকে পর্যাপ্ত খাদ্য ও বাসস্থান পায় না। ফলে জীবেরা এই উপকরণ দুটি লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। তবে এই প্রতিযোগিতা নিম্নলিখিত তিন ধরনের হতে পারে। যথা:

(ক) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Intra-specific struggle) : যখন একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন সদস্য খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে তখন তাকে **অন্তঃপ্রজাতিক** সংগ্রাম বা **স্বপ্রজাতির** সঙ্গে সংগ্রাম বলে। অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এ ধরনের সংগ্রামের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি উদ্ভিদের নিচে যখন একই প্রজাতির অসংখ্য চারাগাছ জন্মায় তখন আলো, বায়ু ও খাদ্যের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় ফলে অধিকাংশ চারা গাছ মরে যায়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, কতিপয় চারাগাছ যথাযথভাবে বৃদ্ধি পেয়ে অপত্য গাছ সৃষ্টি হয়। সীমিত জায়গায় কেবল অল্প সংখ্যক চারাগাছেই বেঁচে থাকা সম্ভব। এটি একটি অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। এছাড়াও মানুষে-মানুষে, বাঘে-বাঘে, হরিণে-হরিণে, কুকুরে-কুকুরে অর্থাৎ একই প্রজাতির জীবের মধ্যে বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম তাই অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। অবশেষে এই সংগ্রামে যারা সফল হয়, তারাই টিকে থাকে।

(খ) আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Inter-specific struggle) : যখন ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা দেখা যায় তখন তাকে **আন্তঃপ্রজাতিক** সংগ্রাম বা **বিষম প্রজাতির** সঙ্গে সংগ্রাম বলে। এই সংগ্রামে যারা জয়ী হয়, তারাই টিকে থাকে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম প্রধানত **খাদ্যভিত্তিক**। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কীটপতঙ্গে-ব্যাঙে, ব্যাঙে-সাপে এবং ময়ূর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ দুটোই ভক্ষণ একটি **খাদ্য-খাদক** সম্পর্কযুক্ত আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম। এছাড়াও সিংহে-হায়নায়, বাঘে-হরিণে, শৃগাল-মুরগিতে, গজার মাছ ও পুঁটি মাছের যে প্রতিযোগিতা তা আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের উদাহরণ।

(গ) পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental struggle) : প্রতিটি জীবকে তার পরিবেশের সঙ্গেও সংগ্রাম করতে হয়। জীব যে পরিবেশে বাস করে সে পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার সাথে জীবের যে সংগ্রাম তাকে **পরিবেশগত সংগ্রাম** বলে। খরা, বন্যা, অধিক তাপ ও শৈত্য, ঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে জীবকে বাঁচবার জন্য লড়াই করতে হয়। অভিযোজ্যতা লাভের মধ্য দিয়ে জীব এই সংগ্রামে জয়ী হয়।

CamScanner

৪। প্রকরণ বা পরিবৃত্তি (Variation) : প্রকরণ বা পরিবৃত্তি জীবজগতের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কোনো দুটি জীবই হুবহু এক রূপ নয়। এমনকি একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যেও কিছু না কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্যেই প্রকরণ। এই প্রকরণ বিভিন্ন কারণে হতে পারে।

ডারউইনের মতে, জীব প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা পরবর্তীকালে সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় এবং কালক্রমে নতুন বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দেয়। এ পরিবর্তনই পরিবৃত্তি বা প্রকরণ। এই প্রকরণ দুই ধরনের হতে পারে, যথা : অনুকূল প্রকরণ ও প্রতিকূল প্রকরণ। অনুকূল বা সুবিধাজনক প্রকরণই জীবের বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক।

৫। যোগ্যতমের বিজয় (Survival of the fittest) : প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে সাফল্য আসে যোগ্যতমের জন্য। খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য এই প্রতিযোগিতায় সব প্রজাতির সদস্য বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং এ সদস্যই সুবিধাজনক প্রকরণের ফলে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়। এসব প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশ সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। ফলে তারা জীবন সংগ্রামে টিকে থাকে। যেসব জীবে সুবিধাজনক পরিবৃত্তি ঘটে না তারা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়। ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণী এ কারণেই জীবনযুদ্ধে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৬। প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি (Natural Selection and origin of new species) : প্রকৃতি যে প্রক্রিয়ায় জীবন সংগ্রামে প্রার্থী নির্বাচন করে তাকেই **প্রাকৃতিক নির্বাচন** (natural selection) বলে। ডারউইনের মতে, জীবন সংগ্রামে যারা টিকে থাকে তারা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত। অন্য কথায় প্রকৃতি দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট বা নির্বাচিত দলই শুধু জীবন সংগ্রামে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই নির্বাচিত ও যোগ্য দলসংগ্রামে টিকে থাকার মতো অনুকূল ও সহায়ক প্রকরণপ্রাপ্ত হয়।

সুবিধাজনক পরিবৃত্তিসম্পন্ন জীব পরিবেশের সাথে সুন্দরভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বংশ বিস্তারের অধিক সুযোগ পায়। অপরদিকে দুর্বল (অযোগ্য) জীব পরিবেশের সাথে খাপ খাইতে পারে না। যেহেতু বংশ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না তাই টিকে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখা দেয় ও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা জীবগুলোর যোগ্য প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো যৌন প্রজননের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সূত্রে বংশধরদের মধ্যে পরিবাহিত হয়। তাই দেখা যায়, শুধু সুবিধাজনক গুণগুলো বংশপরম্পরায় উত্তরসূরিদের মধ্যে সঞ্চারিত ও সংরক্ষিত হয়। এভাবে সুদীর্ঘ বহু বছর ধরে পরের বংশধরদের কতিপয় জীব তাদের পূর্বপুরুষ থেকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হবে। নতুন প্রজাতি সৃষ্টিই অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের মূল বক্তব্য। বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ এবং শ্রেণিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে বংশগতিবিদ্যা মতবাদের এবং বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– দুটি জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্রমচিত্র ঃ সবুজ বিটল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি বলে সহজে পাখিদের বেশি চোখে পড়েছে এবং তাদের খাদ্য হিসেবে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং বাদামি বিটল টিকে গেছে।

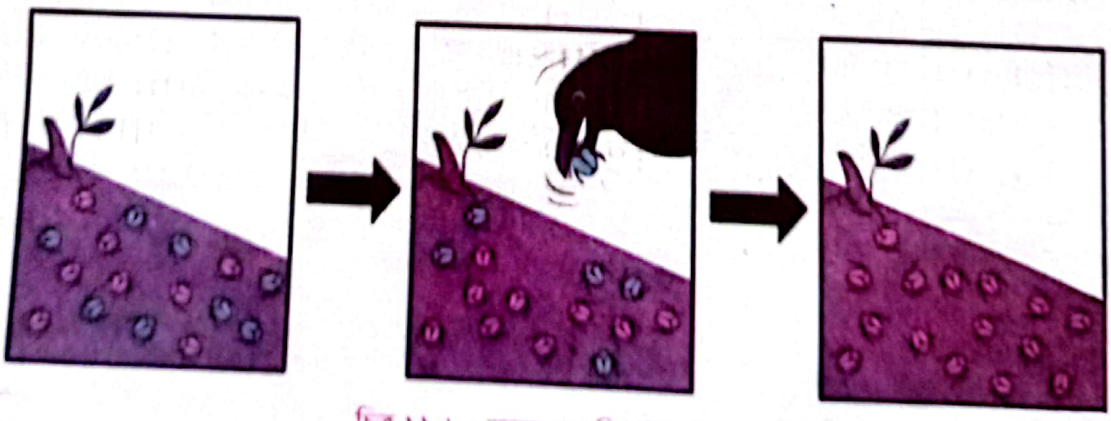

চিত্র ১১.৬ : নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

CamScanner

ডারউইনবাদের সমালোচনা (Criticism of Darwinism)

বিবর্তনে ডারউইনের মতবাদের গুরুত্ব অনেক। কিন্তু এ মতবাদ কোনো দিনই সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। ডারউইনের মতবাদের বিপক্ষে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। যেমন–

- ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী অভিযোজন ও প্রকরণই বিবর্তনের জন্য দায়ী। কিন্তু এ অভিযোজন বা প্রকরণ কীভাবে সংঘটিত হয়, ডারউইন তার ব্যাখ্যা করতে পারেননি।
- ডারউইন যোগ্যতমের জয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি যোগ্যতমের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।
- ল্যামার্কের মতো ডারউইনও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন।
- ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বা লুপ্তপ্রায় অঙ্গের (vestigial organ) উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যায় না।
- ডারউইন বৃহৎ এবং আমুল পরিবর্তন বা মিউটেশন লক্ষ করেছিলেন। তিনি এগুলোকে প্রকৃতির খেলা বা তামাশা (sports or jokes of nature) বলে উপেক্ষা করেছিলেন।
- প্রাকৃতিক নির্বাচন সবসময় সুবিধাজনক (favourable) হয় না। অনেক সময় কোনো বৈশিষ্ট্যের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে (over specialization) জীব অবলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন– দীর্ঘ দাঁতওয়ালা বাঘ (sabre toothed tiger) পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
- প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে নতুন প্রজাতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায় এমন একটি জীবও বংশগতিবিদরা সৃষ্টি করতে পারেননি।
- কখনও কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন– বন্যা, খরা, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি) ফলে অনেক জীব মারা যায়, কেবল ভাগ্যবান জীবগুলো বেঁচে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যোগ্যতমের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।
- বংশগত ও বংশগত নয় এ দু'রকম প্রকরণের পার্থক্য ডারউইন বুঝতে পারেননি। তাঁর মতে, সব রকম প্রকরণই বংশগত কিন্তু সকল প্রকরণ বংশগত নয়।
- ডারউইন প্রকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন যা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ অত্যধিক জটিল ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।
- নির্বাচন কেবল একটি চরিত্রে হয় না। নির্বাচন সমগ্র জীবের উপর কার্যকর। একই জীবে ভালো ও মন্দ চরিত্রের সমাবেশ থাকে। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের ফল অনুমান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
- ডারউইন **প্যানজেনেসিস মতবাদের** (Theory of Pangenesis) মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা এখন আর সমর্থিত নয়।

ল্যামার্কবাদ ও ডারউইনবাদের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ল্যামার্কবাদ (Lamarckism)	ডারউইনবাদ (Darwinism)
১। মতবাদের নাম	অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ (Theory of inheritance of acquired characters)।	প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ (Theory of natural selection)।
২। প্রবর্তনকাল	1809 খ্রিষ্টাব্দ।	1859 খ্রিস্টাব্দ।
৩। যে গ্রন্থে প্রকাশিত	Philosophic Zoologic	On the Origin of Species by Means of Natural Selection
৪। মূল প্রতিপাদ্য	অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার প্রভৃতি।	বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা, জীবন সংগ্রাম, প্রকরণ, যোগ্যতমের বিজয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি প্রভৃতি।
৫। বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কারণ	প্রচেষ্টা, ব্যবহার ও অব্যবহার।	প্রকরণ।
৬। বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের জন্য দায়ী	জীবসত্ত্বা।	প্রকৃতি।
৭। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম	মান্য করা হয় না।	মান্য করা হয়।
৮। গ্রহণযোগ্যতা	কম (অনাদৃত ও পরিত্যক্ত)।	অধিক (সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য)।

CamScanner

নব্য/নয়া-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism)

ডারউইন যখন তাঁর বিবর্তনের মতবাদ প্রকাশ করেন তখন জিনতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না। পরে জিনতত্ত্বের আলোকে এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলে। ফলে ডারউইন মতবাদ অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রকরণ কীভাবে হয় ডারউইন তা বলতে পারেননি; কিন্তু জিনতত্ত্ব এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তাই ডারউইন মতবাদ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ইহাই **নয়া-ডারউইনবাদ** (Neo-Darwinism)।

Neo' শব্দের অর্থ নয়া বা নতুন (new)। Alfred Russel Wallace এবং August Weismann-এর বিবর্তনগত ধারণা এবং মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্বের আলোকে পরিবর্তিত ডারউইনবাদ বোঝাতে 1885 খ্রিষ্টাব্দে George Romanes **'নিও-ডারউইনিজম'** শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্বের (Mendelian Genetics) সাপেক্ষে রূপান্তরিত ডারউইনবাদ যা Darwin-এর প্যানজেনেসিস তত্ত্ব (মিক্স উত্তরাধিকার ধারণা) থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে পৃথক করে তাকে **নয়া-ডারউইনবাদ** বলা হয়।

নয়া-ডারউইনবাদের প্রস্তাবনায় বিজ্ঞানীরা প্রধানত যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেগুলো হলো– **জিনগত প্রকরণ, প্রাকৃতিক নির্বাচন** এবং **জননগত পৃথক্করণ**। নয়া-ডারউইনবাদের প্রধান প্রবক্তা **অগাস্ট ভাইজম্যান** (August Weismann)। তিনি 1895 খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জার্মপ্লাজম মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি ল্যামার্কের 'অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার' তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং প্রকরণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেন। তিনি তাঁর **জার্মপ্লাজম-সোমাটোপ্লাজম** (Germplasm-Somatoplasm) তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে, জীবদেহের প্রোটোপ্লাজম দুই ধরনের যথা–**সোমাটোপ্লাজম** ও **জার্মপ্লাজম**। সোমাটোপ্লাজম দেহকোষে এবং জার্মপ্লাজম জননকোষে অবস্থান করে। জার্মপ্লাজমে যৌন জননের মাধ্যমে জীবদেহের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরে স্থানান্তরিত করে কিন্তু সোমাটোপ্লাজম তা পারে না। তাই সোমাটোপ্লাজমবাহী দেহকোষে পরিবর্তন ঘটলেও তা সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয় না। তিনি প্রকরণ বা পরিবৃত্তির ব্যাখ্যায় বলেন যে, জননকোষের অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার ফলেই পরবর্তী বংশধরে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে।

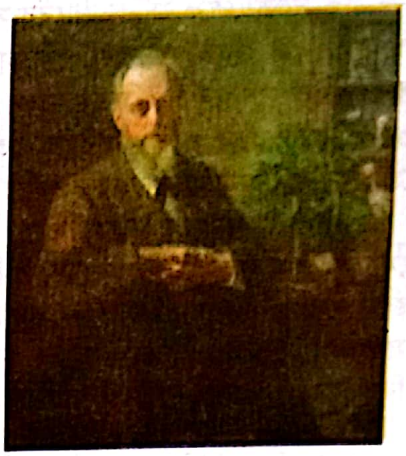

August Weismann
(1834-1914)

নয়া-ডারউইনবাদের মূল প্রতিপাদ্য

- নয়া-ডারউইনবাদে প্রকরণের জিনতাত্ত্বিক ভিত্তি নির্দেশিত হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণরূপে জিনগত প্রকরণকে দায়ী করা হয়। কারণ জিনগত প্রকরণের বংশপরম্পরায় সঞ্চারণ ঘটে।
- নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক হলো জিনতাত্ত্বিক উপাদান এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ।
- নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে বিচ্ছিন্নতার (isolation) কারণেও নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে।

ডারউইনবাদ ও নয়া-ডারউইনবাদের পার্থক্য

ডারউইনবাদ (Darwinism)	নয়া-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism)
১। Darwin প্রবর্তিত তত্ত্ব।	১। মেন্ডেলীয় জিনতত্ত্ব, Weismann প্রমুখ বিজ্ঞানীর বিবর্তন সম্বন্ধীয় ধারণার সাপেক্ষে রূপান্তরিত ডারউইনবাদ।
২। প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশনের উৎস ও উত্তরাধিকারের ধারণা পাওয়া যায় না।	২। প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশনের উৎস ও উত্তরাধিকারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।
৩। ডারউইনবাদ অনুসারে সকল প্রকরণের উত্তরাধিকার ঘটে।	৩। নয়া-ডারউইনবাদ অনুসারে শুধুমাত্র জিনগত প্রকরণের উত্তরাধিকার ঘটে।
৪। প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক ব্যক্তিসত্ত্বা বা জীবসত্ত্বা (individual)।	৪। প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক জনগোষ্ঠী (population)।
৫। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।	৫। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াও বিচ্ছিন্নতার (isolation) মাধ্যমেও নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটাতে পারে।
৬। নিষ্ক্রিয় অঙ্গ, অপরিবর্তিত জীব, নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।	৬। নিষ্ক্রিয় অঙ্গ, অপরিবর্তিত জীব, নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

CamScanner

বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণাদি (Evidences of Evolution)

বিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সপক্ষে বিজ্ঞানীরা কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন–

১। জীবাশ্মগত ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ (Palaeontological and Geological Evidences)

পাললিক শিলার স্তরে স্তরে যুগ যুগ ধরে যেসব জীবাশ্ম জমা হয়েছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবর্তনের অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। শিলাস্তরে সংরক্ষিত এমন কোনো নিদর্শন যা প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো জীবের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে তাই **জীবাশ্ম** (fossil) বলে। অর্থাৎ অদূরে বিলুপ্ত কোনো জীবের দেহ বা দেহাংশ বা কোনো চিহ্ন প্রাকৃতিক উপায়ে পাললিক শিলায় প্রস্তরীভূত হয়ে সংরক্ষিত থাকলে তাকে জীবাশ্ম (fossil) বলে। (fossil : ল্যাটিন শব্দ fossilum মাটির নিচ থেকে খনন করে পাওয়া কোন বস্তু)। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা ও বিশদ আলোচনা করা হয় তাকে জীবাশ্মবিজ্ঞান বা প্যালিওন্টোলজি (plantology) বলে।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিশাল জলাধারগুলোর তলায় যে পাললিক শিলাস্তর সৃষ্টি হয়েছে তাতে সেকালের জীবজন্তুর দেহাবশেষ সংরক্ষিত হয়েছে। ১৫০ কোটি বছর পূর্বে সৃষ্ট শিলাস্তরে সর্বপ্রথম আদি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। জীবাশ্ম যে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে তা বিভিন্ন যুগে কোনো বিশেষ একটি জীবের জীবাশ্ম পরীক্ষা করলে যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি কখনো কোনো জীবাশ্ম দুটি ভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ইঙ্গিতও বহন করে। এ ধরনের জীবাশ্মকে **সংযোগকারী জীবাশ্ম** (connecting fossil) বলে। ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী ছিল এমন প্রমাণ নেই। তবে ১৫০ কোটি বছর পূর্বের শিলাস্তর অর্থাৎ **প্রোটেরোজয়িক** মহাযুগে আদি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়।

প্যালিওজয়িক মহাযুগে প্রায় সাড়ে সাঁইত্রিশ কোটি বছর পূর্বে সর্বপ্রথম উভচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। মেসোজয়িক মহাযুগে প্রথম স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ দেখা যায়। সাড়ে ষোলো কোটি বছর পূর্বে দাঁতযুক্ত পাখির ন্যায় জীব ছিল। এদের সরীসৃপ ও পাখির মধ্যে সংযোগকারী প্রাণী বলে চিহ্নিত করা হয়। মাত্র দুই কোটি বছর পূর্বে সর্বপ্রথম মানুষের আগমন ঘটে। কোটি কোটি বছর ধরে বিভিন্ন শিলাস্তরে যে জীবাশ্ম জমা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিবর্তনের সপক্ষে একটি জোরালো প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত।

(ক) ঘোড়ার বিবর্তন (Evolution of horse) : ছয় কোটি বছর পূর্বে ঘোড়ার (*Equus equus*) আদি পূর্বপুরুষ ইওহিপ্পাস (*Eohippus*) প্রায় 0.4m উঁচু ছিল। এর সামনের পায়ে ৪টি এবং পিছনের পায়ে ৩টি নখযুক্ত আঙুল ছিল। ইওহিপ্পাসের পরবর্তীধারা মেজোহিপ্পাসের (*Mesohippus*) উচ্চতা ছিল 0.6m এবং এর পায়ে তিনটি করে আঙুল ছিল। পরবর্তী স্তরে 1.0m উঁচু মেরিচিপ্পাসের (*Merychippus*) ৩টি আঙুলের মধ্যে ১টি কর্মক্ষম ছিল। এর পরে আগমন ঘটে 1.2m উঁচু প্লায়োহিপ্পাস (*Pliohippus*) জাতীয় ঘোড়ার। এর সামনের ও পিছনের পায়ে ১টি মাত্র আঙুল দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক কালের 1.6m উঁচু ইকুয়াস (*Equus*) ঘোড়া এই প্লায়োহিপ্পাসের বংশধর। ঘোড়াদের বিবর্তনিক পথ হলো:

ইওহিপ্পাস ⟶ মেজোহিপ্পাস ⟶ মেরিচিপ্পাস ⟶ প্লায়োহিপ্পাস ⟶ ইকুয়াস

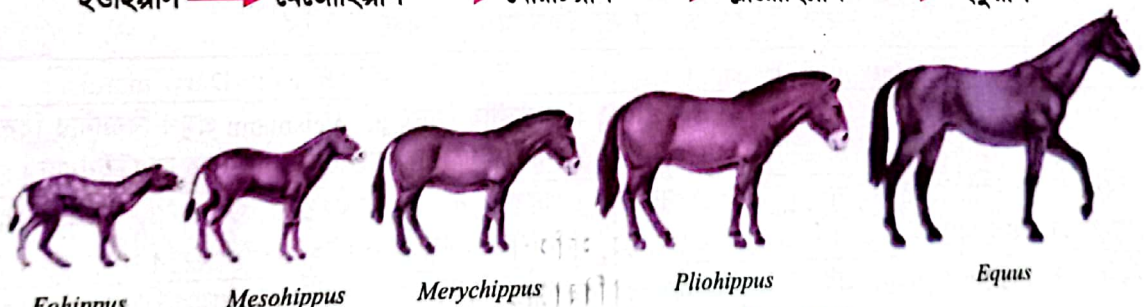

চিত্র ১১.৭ : ঘোড়ার বিবর্তনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

ঘোড়ার বিবর্তনের পথে ক্রমান্বয়ে সাধারণ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যথা–

i. ক্রমান্বয়ে পায়ের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি,
ii. পায়ের আঙুলের সংখ্যার ক্রমিক হ্রাস,
iii. শক্ত মাটিতে দ্রুত চলাফেরার জন্য খুরের উৎপত্তি,
iv. প্রিমোলার ও মোলার দাঁতের পুরু মুকুট সৃষ্টি এবং
v. সুগঠিত পেশিসহ ক্রমান্বয়ে দেহের আয়তন বৃদ্ধি।

CamScanner

(খ) লুপ্ত সংযোজক বা মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম (Missing link or Connecting fossil) : বিবর্তনগতভাবে নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী জীবগোষ্ঠী যারা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং যাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর জীবেরই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, তাদের লুপ্ত সংযোজক বা মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম বলা হয়। সংক্ষেপে, যে জীবাশ্মের মাধ্যমে দুটি পর্ব বা গ্রুপের প্রাণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম বলে। এরা ট্রানজিশনাল ফসিল (transitional fossil) হিসেবেও পরিচিত। আর্কিওপটেরিক্স (*Archaeopteryx*)-কে মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম বা বিবর্তনিক সংযোগকারী প্রাণী বলে। কারণ এটি সরীসৃপ ও পাখির মধ্যবর্তী প্রাণী এবং এতে সরীসৃপ ও পাখি জাতীয় প্রাণীর বৈশিষ্ট্যাবলি দেখা যায়। আজ থেকে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে জুরাসিক যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল। Andreas Wagner (1861) জার্মানির ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত সোলেন হোপেন অঞ্চল থেকে এর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। এরপর এর আরও দশটি জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়।

চিত্র-১১.৮ক : *Archaeopteryx* এর (ক) জীবাশ্মের ছাপ, (খ) কাল্পনিক আকৃতি।

আর্কিওপটেরিক্সের সরীসৃপ বৈশিষ্ট্য :

১। দেহ সরীসৃপের ন্যায় লম্বা ও ২০টি কশেরুকাযুক্ত লম্বা লেজ ছিল।
২। দেহকঙ্কাল পুরু ও ভারী হাড় দ্বারা গঠিত।
৩। নখরযুক্ত আঙুলি বিদ্যমান।
৪। দাঁতযুক্ত চোয়াল এবং শুষ্ক আঁইশ দ্বারা দেহ আবৃত।

আর্কিওপটেরিক্স-এর পাখির বৈশিষ্ট্য :

১। দেহের গঠন পাখির ন্যায়।
২। ডানা আকৃতির অগ্রপদ এবং অগ্রপদে ৩টি আঙুলের উপস্থিতি।
৩। হাড় পাখির মতো হালকা এবং লেজ ও ডানায় পালক বিদ্যমান।
৪। ঠোঁট চঞ্চুতে রূপান্তরিত।

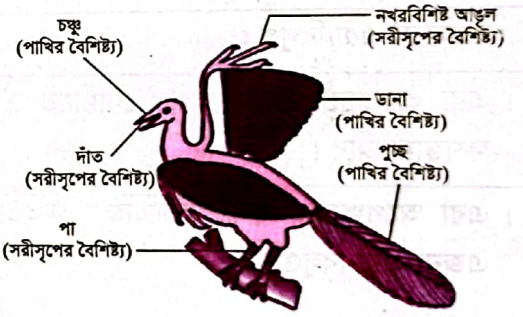

চিত্র-১১.৮খ : সরীসৃপ ও পাখির বৈশিষ্ট্যের চিত্ররূপ

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি থেকে বিবর্তনবিদরা ধারণা করেন যে, সরীসৃপ থেকে পাখিজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলে (Julian Huxley) পাখিদের গ্লোরিফায়েড রেপ্টাইল (Birds are glorified reptiles) বা মহিমান্বিত সরীসৃপ বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই আর্কিওপটেরিক্স বিবর্তনের সপক্ষে একটি জোরালো প্রমাণ। পাখিদের বিবর্তনিক পথ হলো :

সরীসৃপ ⟶ আর্কিওপটেরিক্স ⟶ পাখি

(গ) সংযোগকারী যোগসূত্র বা কানেকটিং লিংক (Connecting link) : দুটি পৃথক জীবগোষ্ঠীর (প্রজাতি, শ্রেণি, পর্ব ইত্যাদি ট্যাক্সা) বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মধ্যবর্তী বা সংযোগসাধনকারী জীবদের (বর্তমানে অস্তিত্ব রয়েছে এরূপ) সংযোগকারী যোগসূত্র বা সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিংক বলে। এদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিলও

CamScanner

(living fossil) বলা যায়। উদাহরণ হিসেবে Platypus (*Ornithorhynchus*) ও Lung fish (*Protopterus*) উল্লেখ করা হলো।

প্লাটিপাস (Platypus) : সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর মধ্যবর্তী কানেকটিং লিংক।

সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য : করোটি, পেক্টোরাল গার্ডল, ওভিপেরাস ও রেচন-জননতন্ত্র ইত্যাদি।

স্তন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য : স্তনগ্রন্থি (বৃন্তহীন), দেহ লোমাবৃত, ডায়াফ্রাম ইত্যাদি।

লাং ফিস (Lung fish- *Protopterus*) : মৎস্য ও উভচরের মধ্যবর্তী কানেকটিং লিংক।

মৎস্যের বৈশিষ্ট্য : পাখনা, আঁইশ, পার্শ্বরেখা ইত্যাদি।

উভচরের বৈশিষ্ট্য : ফুসফুস, তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি। এ ছাড়াও *Limulus, Chimaera, Peripatus, Sphenodon, Latimaria* প্রভৃতিও সংযোগকারী জীব বা জীবন্ত জীবাশ্ম।

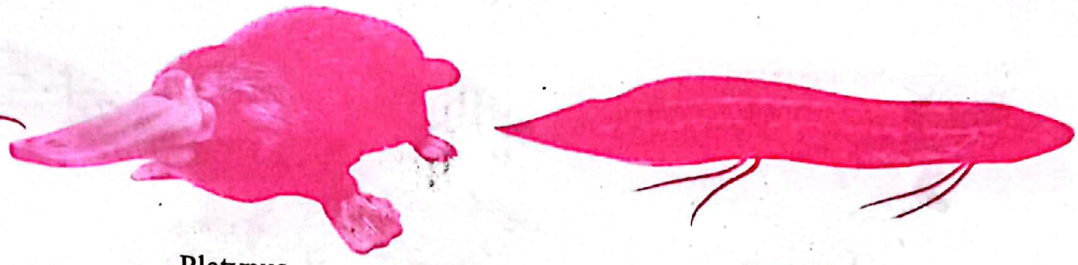

Platypus Lung fish

চিত্র-১১.৯ : সংযোগকারী যোগসূত্র বা কানেকটিং লিংক (জীবন্ত জীবাশ্ম)

মিসিং লিংক ও কানেকটিং লিংক-এর পার্থক্য

মিসিং লিংক বা সংযোগকারী জীবাশ্ম (Missing link or Connecting fossil)	সংযোগকারী যোগসূত্র বা কানেকটিং লিংক (Connecting link)
১। বর্তমানে এরা বিলুপ্ত।	১। বর্তমানে এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান।
২। এরা একগোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীতে রূপান্তরের ক্ষণস্থায়ী জীব।	২। এরা দুটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী জীব।
৩। এরা অপেক্ষাকৃত কম অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য এরা বিলুপ্ত।	৩। এরা অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে (যেমন– প্লাটিপাস দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় বেঁচে রয়েছে)। এরা জীবন্ত জীবাশ্ম নামেও পরিচিত।

২। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Taxonomic Evidences)

জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের দিকে লক্ষ করলে বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ মেলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস পর্ব, শ্রেণি, বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতি ইত্যাদি ধাপে বিভক্ত। শ্রেণিবিন্যাসের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে **প্রজাতি** (species)। যেসব প্রাণী বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্যযুক্ত এবং নিজেদের মিলনে উর্বর বংশধর তৈরিতে সক্ষম তারা একই প্রজাতিভুক্ত। পৃথিবীর সকল মানুষ একটি প্রজাতি; এর নাম *Homo sapiens*। এভাবে কতগুলো একই ধরনের প্রজাতি মিলে 'গণে' এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে গোত্র, বর্গ, শ্রেণি, পর্ব এবং সর্বোপরি প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ গঠন করা হয়েছে। পর্ব থেকে ধাপে ধাপে প্রজাতি পর্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায় প্রাণীদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ততই অধিক হয়। একই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে, তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

শ্রেণিবিন্যাসে দেখা যায়, কোনো কোনো প্রাণী যেমন পিঁপড়ে দুটি ভিন্ন শ্রেণির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং তাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। মধ্যবর্তী প্রাণী হিসেবে এরা বিবর্তনের প্রমাণ ও গতিপথ নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, শ্রেণিবিন্যাস বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

CamScanner

৩। জীব-ভৌগোলিক প্রমাণ (Biogeographical Evidences)

সাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠকে কতগুলো ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এসব অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যেমন পার্থক্য তেমনি সাদৃশ্যও রয়েছে, ইহাই অভিব্যক্তির নির্দেশক। প্রাণিকুলের বিস্তারের ভিত্তিতে **A.R. Wallace** 1870 খ্রিষ্টাব্দে ভূপৃষ্ঠকে মোট ৬টি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এসব অঞ্চলের পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রজাতিরও পার্থক্য দেখা যায়। এমনকি একই প্রজাতির জীবের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার **মারসুপিয়াল** (marsupial) এ কারণেই কিছুটা ভিন্ন ধরনের। একিডনা, প্লাটিপাস, ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি প্রাণী অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না। ক্যাঙ্গারু এক প্রকার থলিবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিন্তু উন্নত ধরনের অমরাবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী সৃষ্টি হওয়ার পর পরাজিত হয়ে থলিবিশিষ্ট স্তন্যপায়ীরা লোপ পায়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে এখানে এরা আজও টিকে আছে। দক্ষিণ আমেরিকা অন্যান্য মহাদেশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম বলে সেখানে কিছু কিছু থলিবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী আধুনিককাল পর্যন্ত টিকে আছে।

চিত্র ১১.১০ : অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাঙ্গারু

ফ্লোরিডা ও বাহামাস দুটি পাশাপাশি অঞ্চল। কিন্তু এখানকার জীবজন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। আবার আমেরিকা থেকে ইউরেশিয়া যদিও বহুদূরে অবস্থিত তথাপি এদের জীবজন্তুর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। জীবজন্তুর বিস্তৃতির পর্যালোচনাকালে যে প্রশ্ন মনে আসে তা একমাত্র বিবর্তন দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়।

৪। অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ (Morphological Evidences)

অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (morphology) জীবের আকার, আকৃতি ও গঠন (বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন গ্রুপের অন্তর্গত প্রাণীদের অঙ্গের গঠন তুলনা করলে বিবর্তন সম্পর্কে প্রমাণ মেলে।

(ক) তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy) : অঙ্গসংস্থানিক গঠনে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত থেকে উন্নততর জীবে বৃদ্ধি ও জটিলতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রমপরিবর্তন উল্লেখ করা যেতে পারে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড : মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠনের তুলনা করলে দেখা যায়, মাছের হৃৎপিণ্ড দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, সরীসৃপের হৃৎপিণ্ড আংশিক চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (কুমির চার প্রকোষ্ঠ) এবং পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড **সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ** বিশিষ্ট। কাজেই সরলতম হৃৎপিণ্ড থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সরল প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে জটিল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

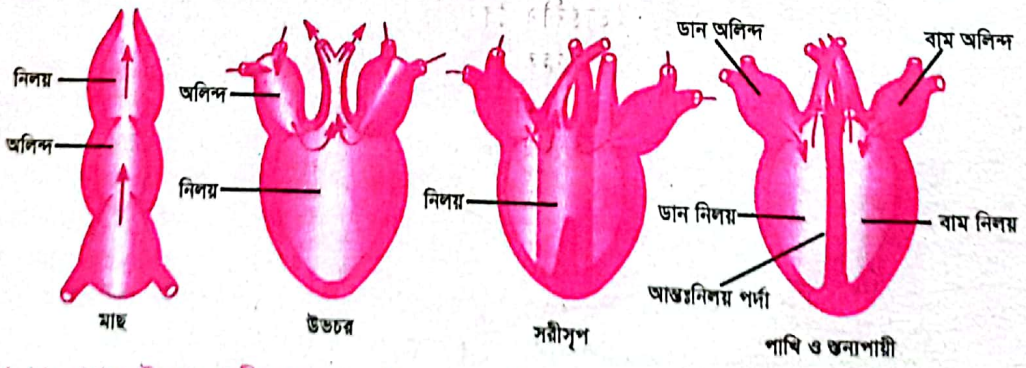

চিত্র ১১.১১ : মাছ, উভচর, সরীসৃপ এবং পাখি ও স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ডের ক্রমশ বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের তুলনা

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক : সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর অর্থাৎ মাছ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত সকলের মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন একই রকম (অর্থাৎ ৫টি ভাগে বিভক্ত)। কিন্তু বিবর্তনের ফলে মস্তিষ্কের মৌলিক গঠন ব্যতিরেকে **সেরিব্রাম** (cerebrum) বা গুরুমস্তিষ্ক ও **সেরিবেলাম** (cerebellum) বা লঘুমস্তিষ্কের আকৃতি ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর সেরিব্রাম সবচেয়ে উন্নত। মানুষের সেরিব্রাম মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সরল প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে জটিল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

চিত্র ১১.১২ : মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের ধারাবাহিক বিবর্তন

(খ) সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organs) : যেসব অঙ্গ **উৎপত্তি** ও **অন্তর্গঠনের** দিক থেকে এক হলেও, বাহ্যিক গঠন এবং কাজের ধরনের দিক থেকে আলাদা (কখনো কখনো কাজের দিক থেকে অনুরূপ হতে পারে), তাদের **সমসংস্থ অঙ্গ** বলে। **অপসারী বিবর্তনের** (divergent evolution) ফলে সমসংস্থ অঙ্গ গঠিত হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণিদের অগ্রপদ, যেমন- ব্যাঙের অগ্রপদ, গোসাপের পা, গিরগিটির অগ্রপদ, গিনিপিগের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত, সীল বা তিমির ফ্লিপার ইত্যাদি। তবে এদের গঠন ও আকৃতি জীবন পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রগতিশীল অঙ্গে রূপ নিয়েছে।

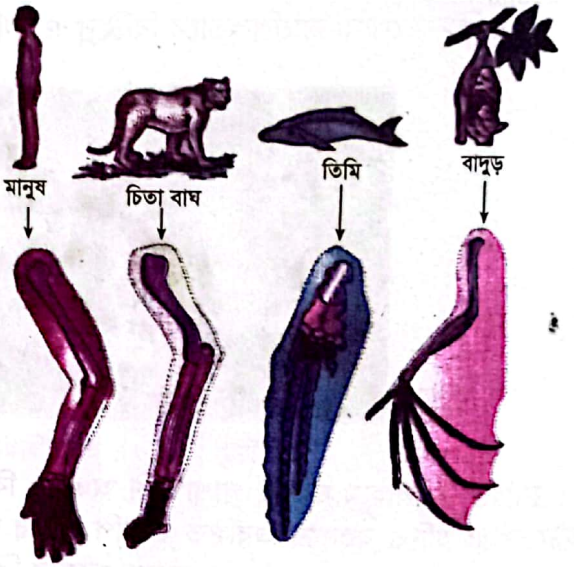

চিত্র ১১.১৩ : প্রাণীর সমসংস্থ অঙ্গ

(গ) সমবৃত্তি অঙ্গ (Analogous Organs) : যেসব অঙ্গ **কার্যগতভাবে** একই ধরনের কিন্তু উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে পৃথক, তাদের **সমবৃত্তি অঙ্গ** বলে। **অভিসারী বিবর্তনের** (convergent evolution) ফলে সমবৃত্তি অঙ্গ গঠিত হয়। যেমন- পতঙ্গের ডানা, বাদুড়ের ডানা ও পাখির ডানা, মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছার হুল, মাছের পাখনা ও তিমি মাছের ফ্লিপার, অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি। বাদুড়, আরশোলা অথবা প্রজাপতি ডানার সাহায্যে উড়ে থাকে। আরশোলা অথবা প্রজাপতি ডানার অভ্যন্তরীণ গঠন এবং এদের উৎপত্তির সাথে বাদুড় অথবা পাখির ডানার কোনো সাদৃশ্য নেই।

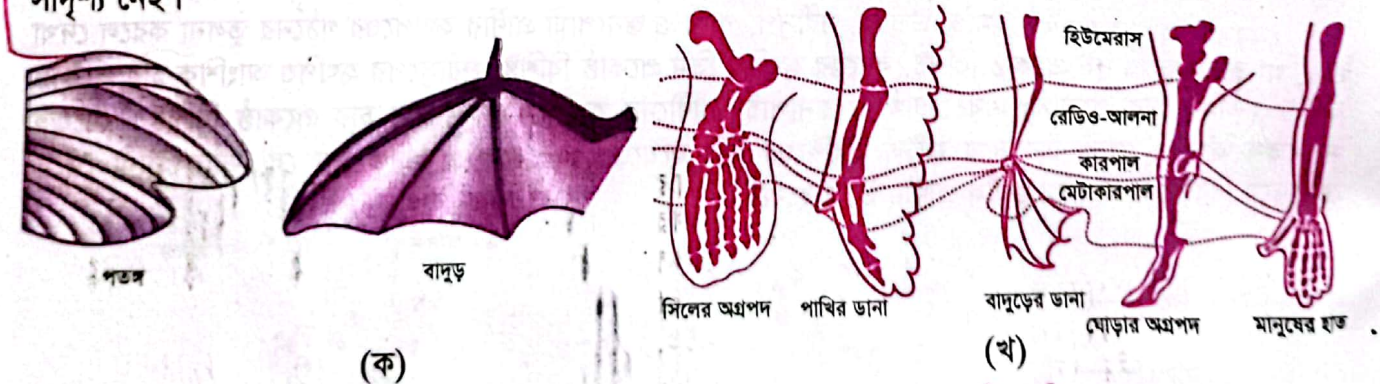

চিত্র ১১.১৪ : (ক) প্রাণীর সমবৃত্তি অঙ্গ ও (খ) বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদের কঙ্কালের বৃদ্ধি ও বিকাশলাভের তুলনা

কতগুলো অঙ্গ পরস্পরের সমসংস্থ এবং সমবৃত্তি উভয়ই হতে পারে। সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ বিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। আদি জীবনের সৃষ্টির পর এ প্রাণস্রোত পরিবেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিব্যক্তির এ প্রবাহ স্রোত এনেছে অপরূপ রূপান্তরের ঢেউ। সমসংস্থ অঙ্গ পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্দেশ করে। সমবৃত্তি অঙ্গগুলো একই রকম জীবনধারার ইঙ্গিত দেয়। সমসংস্থ এবং সমবৃত্তি অঙ্গের ব্যাখ্যা একমাত্র অভিব্যক্তির মাধ্যমেই করা যায়। তাই বলা যায়, সৃষ্টি একবারই হয়েছে, বিবর্তনের মাধ্যমে এদের বিকাশ ঘটেছে বারে বারে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে।

CamScanner

(ঘ) নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (Vestigial Organs) : প্রাণিদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এ সকল অঙ্গগুলোকে **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ** বলে। এসব অঙ্গ বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণ বহন করে। উক্ত অঙ্গগুলো অতীতে জীবের পূর্বসূরিতে যথেষ্ট কার্যগত গুরুত্বসম্পন্ন হলেও বর্তমানে কার্যহীন। সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য জীবে সমরূপ অঙ্গ যথেষ্ট কার্যকারিতাযুক্ত হতে পারে। মানবদেহে প্রায় ১০০টি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বিদ্যমান। যেমন– মানুষের কানের পেশি, ছেদন দাঁত, আক্কেল দাঁত, অ্যাপেন্ডিক্স, পুচ্ছাস্থি, কক্কিক্স, গায়ের লোম, উপপল্লব, পুরুষের স্তনগ্রন্থির বৃন্ত ইত্যাদি।

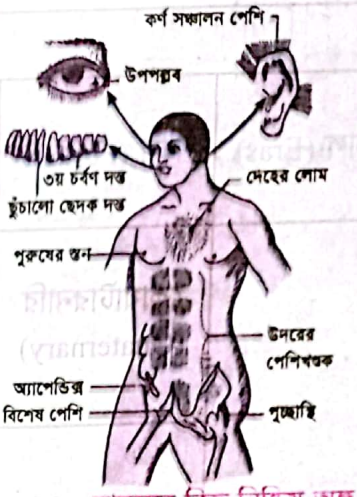

চিত্র ১১.১৫ : মানুষের কিছু নিষ্ক্রিয় অঙ্গ

সমসংস্থ অঙ্গ ও সমবৃত্তি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য

সমসংস্থ অঙ্গ	সমবৃত্তি অঙ্গ
১। এরা অভ্যন্তরীণ গঠনে সাদৃশ্যযুক্ত।	১। এরা অভ্যন্তরীণ গঠনে যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত নয়।
২। এরা উৎপত্তি ও বিবর্তনগত বিকাশমূলক ভাবে সদৃশ।	২। এরা উৎপত্তি ও বিবর্তনগত বিকাশমূলক ভাবে বিসদৃশ।
৩। কার্যগতভাবে এরা এক বা ভিন্ন।	৩। কার্যগত ভাবে এরা সর্বদা এক।
৪। অপসারী বিবর্তনের (divergent evolution) ফলে গঠিত হয়।	৪। অভিসারী বিবর্তনের (convergent evolution) ফলে গঠিত হয়।
৫। ভিন্নরূপ পরিবেশে অভিযোজিত।	৫। সমরূপ পরিবেশে অভিযোজিত।
৬। জাতিজনিগত সম্বন্ধযুক্ত।	৬। জাতিজনিগত সম্বন্ধযুক্ত নয়।
৭। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণিদের অগ্রপদ, যেমন- ব্যাঙের অগ্রপদ, গোসাপের পা, গিরগিটির অগ্রপদ, গিনিপিগের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত, সীল এর ফ্লিপার ইত্যাদি সমসংস্থ অঙ্গ।	৭। পতঙ্গের ডানা, বাদুড়ের ডানা ও পাখির ডানা, মৌমাছি ও কাঁকড়াবিছার হুল, মাছের পাখনা ও তিমি মাছের ফ্লিপার, অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি সমবৃত্তি অঙ্গ।

৫। ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ (Embryological Evidences)

ভ্রূণবিজ্ঞান অভিব্যক্তির ওপর প্রত্যক্ষ আলোকপাত করে। প্রত্যেক জীব নিষিক্ত ডিম্ব তথা জাইগোট থেকে জীবনযাত্রা শুরু করে। পুরুষ প্রাণীর শুক্রাণু ও স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে যে জাইগোট সৃষ্টি করে তা স্ত্রী প্রাণীর গর্ভে বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি করে এবং এই ভ্রূণ থেকেই পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ পরীক্ষা করলে বিবর্তনের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।

পরিণত অবস্থায় প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও ভ্রূণাবস্থায় কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, মুরগি, গরু, মানুষ প্রভৃতি প্রাণীর ভ্রূণ প্রায় হুবহু একই রকম। এসব প্রাণী যে একই পূর্বপুরুষের বংশধর ভ্রূণের গঠনগত মিল তাই প্রমাণ করে। বানর ও মানুষের ভ্রূণ একেবারে হুবহু একই রূপ। এ থেকে অনুমান করা হয় যে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিল। ভ্রূণের এই সাদৃশ্য লক্ষ করে **ভন বেয়ার** (Von Bear, 1818) বলেছেন যে, ভ্রূণের প্রথম অবস্থায় সাধারণ লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়। অতঃপর ভ্রূণের বৃদ্ধির সাথে অন্যান্য লক্ষণগুলোর দেখা যায়, পরিশেষে প্রজাতির লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়। ভ্রূণের মিলের ওপর ভিত্তি করে জার্মান বিজ্ঞানী **হেকেল** (Haeckel,1866) **'পুনরাবৃত্তি মতবাদ'** (Theory of recapitulation) বা Biogenic Law প্রচার করেন। তাঁর মতে, **ব্যক্তিজনিতে জাতিজনির পুনরাবৃত্তি** (Ontogeny Recapitulates Phylogeny) ঘটে। অর্থাৎ কোনো একটি প্রাণীর জীবন ইতিহাসে (ভ্রূণাবস্থায়) তার পূর্বপুরুষের জীবন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মেরুদণ্ডী (মাছ থেকে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত) প্রাণীর ভ্রূণাবস্থায় ফুলকাছিদ্র, দ্বি-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড ও অনেক আওর্টিক আর্চ থাকে। ভ্রূণের এই মিল থেকে অনুমান করা হয় যে, মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, মুরগি, মানুষ একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

চিত্র ১১.১৬ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের সাদৃশ্য

CamScanner

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale)

মহাকাল (Eras)	কাল (Period)	যুগ (Epoch)	বছর আগে (মিলিয়ন)	প্রধান প্রাণী (Dominant Animals)	মন্তব্য (Remarks)
সিনোজয়িক (Cenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	রিসেন্ট (Recent/Holocene)	০.০২	আধুনিক মানুষ, বিভিন্ন স্তন্যপায়ী, পাখি, মাছ ও সভ্যতার উদ্ভব।	আধুনিক যুগ (Age of Modern life)
		প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	১.৮	মানুষের আবির্ভাব; বৃহদাকার স্তন্যপায়ীর অবলুপ্তি।	
	টারশিয়ারি (Tertiary)	প্লিওসিন (Pliocene)	৫	আধুনিক স্তন্যপায়ীর উদ্ভব এবং আদি মানবের আবির্ভাব ও বিচরণ।	স্তন্যপায়ীদের যুগ (Age of Mammals)
		মায়োসিন (Miocene)	২৬	স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য (বিশেষ করে মানুষ সদৃশ এপ্ এর আবির্ভাব)।	
		ওলিগোসিন (Oligocene)	৩৮	নানা প্রকার স্তন্যপায়ী।	
		ইওসিন (Eocene)	৫৭	আদি স্তন্যপায়ীদের অবলুপ্তি; প্লাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	৬৮	স্তন্যপায়ীদের সর্বাধিক বিবর্তন (আদিম স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য)	
মেসোজয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)		১৩৫	ডাইনোসরদের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, আধুনিক পাখির উদ্ভব; আদি স্তন্যপায়ী।	সরীসৃপদের যুগ (Age of Reptiles)
	জুরাসিক (Jurassic)		১৮৫	ডাইনোসরদের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য, দাঁতযুক্ত পাখির উদ্ভব। সরীসৃপদের বিস্তার।	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		২২৫	ডাইনোসরের উদ্ভব; স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য। আদি উভচরদের অবলুপ্তি।	
প্যালিওজয়িক (Paleozoic)	পারমিয়ান (Permian)		২৮৫	আধুনিক কীটপতঙ্গ উৎপত্তি; বহু আদি প্রাণী লুপ্ত; স্থলে প্রাণীর আবির্ভাব।	উভচরদের যুগ (Age of Amphibians)
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		৩৬০	উভচরদের প্রাচুর্য ও প্রাধান্য; পতঙ্গদের প্রাচুর্য, কন্টকত্বক প্রাণী, হাঙ্গর, সরীসৃপের প্রথম উদ্ভব।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		৪০০	নানা রকম মাছের প্রাধান্য; উভচরের উৎপত্তি।	মাছেদের যুগ (Age of Fishes)
	সিলুরিয়ান (Silurian)		৪৪০	মাছের উদ্ভব ও বিকাশ; পতঙ্গে উদ্ভব; অনেক অমেরুদণ্ডীর অবলুপ্তি।	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		৫১০	অমেরুদণ্ডীদের প্রাধান্য; প্রবাল, চোয়ালবিহীন কর্ডাটা এবং মাছের উদ্ভব।	অমেরুদণ্ডীদের যুগ (Age of Invertebrates)
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		৫৫০	বিভিন্ন অমেরুদণ্ডীদের উদ্ভব ও প্রাধান্য। ট্রাইলোবাইটের উদ্ভব।	
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			১৫০০	প্রথম প্রাণীর উৎপত্তি (আদ্যপ্রাণী)।	Age of Early life
আরকিওজয়িক (Archeozoic)			৩৫০০	জীবনের আবির্ভাব (কোনো জীবাশ্ম নেই)।	Age of Origin life

CamScanner

৬। শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ (Physiological Evidences)

বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে রাসায়নিক ও জৈবসাদৃশ্যে জৈব রাসায়নিক মিল দেখা যায়। যেসব প্রাণী নিকটতম আত্মীয় তাদের মধ্যেই রাসায়নিক সাদৃশ্য বেশি। নিকটতম আত্মীয়ের রক্তে রাসায়নিক মিল রয়েছে। আবার আত্মীয় জীবের মধ্যে রক্তের গরমিল দেখা যায়। নিকটতম আত্মীয়ের হিমোগ্লোবিন স্ফটিক, প্লাজমা প্রোটিন, এনজাইম ও হরমোন সাক্ষ্য বহন করে যে, তাদের পূর্বপুরুষ এক ছিল। ট্রিপসিন প্রোটিনজাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে সাহায্য করে।

বানর, নরবানর এবং মানুষের শরীরে ট্রিপসিন পরীক্ষা করলে দেখা যায়, এদের রাসায়নিক উপাদান ও কর্মপদ্ধতি এক প্রকার। বানরের রক্তের সঙ্গে গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক এসিড মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে এটি স্ফটিকাকারে পরিণত হয়, এ স্ফটিকগুলোকে হিমোগ্লোবিন স্ফটিক বলে। দেখা গেছে যে, মানুষের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার এবং বানরের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের মতো। ঘোড়া ও কুকুরের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার আবার ভিন্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ও বানর নিকট আত্মীয়। বানরের পূর্বপুরুষ থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

৭। জীবরসায়নঘটিত প্রমাণ (Biochemical Evidences)

জীব রসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল প্রাণীতে মোটামুটি কতগুলো জৈবিক উপাদান বিদ্যমান। যেমন– আমিষ, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি। এসব উপাদানের আণবিক গঠনগত মিলও লক্ষণীয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, সকল জীবই একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি। আদি জীব থেকে জটিলতম জীবে এসব উপাদানের উপস্থিতিই বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে।

৮। কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Cytological Evidences)

অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত যেকোনো জীব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এদের দেহ একই উপাদানে গঠিত। এদের কোষের গঠন পদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই। সকল জীবের প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক উপাদান মূলত এক। কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন একই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। সুতরাং দুটি প্রাণীর মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন এদের ভিত্তি এক। পরে জীবকোষের বিভিন্ন রকম গঠন ও পরিবর্তনই তাদের ক্রমবিকাশকে সম্ভব করেছে।

৯। জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Genetical Evidences)

জীবদেহের বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক জিন (gene)। জিনের সঞ্চারণক্ষম স্থায়ী পরিবর্তনই **পরিব্যক্তি বা মিউটেশন** (mutation)। এই জিনের পার্থক্যজনিত কারণে একটি প্রজাতি অন্য একটি প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কৃত্রিম উপায়ে জিনের পরিবর্তন সাধন সম্ভব। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মেও এই জিনের পরিবর্তন ঘটাই স্বাভাবিক। ফলে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়ে বিবর্তনের ধারাকে এগিয়ে নিয়েছে। সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় নতুন ধরনের জীব সৃষ্টি সম্ভব। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, প্রাকৃতিক উপায়ে এরূপ সংকরায়ণ ব্যাপকভাবে ঘটবে এবং ফলে নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হবে।

❑ কাজ : (i) বিবর্তনের ধারায় প্রতিটি জীবই নতুন পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে– ব্যাখ্যা কর। (ii) জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ, বিবর্তন মতবাদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।/জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। (iii) লম্বা গলাবিশিষ্ট প্রাণীর বিবর্তনের যে তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়, তার বর্ণনা দাও। (iv) বাঘ সুন্দরবনে টিকে থাকার কারণগুলো বিবর্তনের আলোকে ব্যাখ্যা কর। (v) ডাইনোসরের অস্তিত্বের প্রমাণ কীভাবে পাওয়া সম্ভব ব্যাখ্যা কর।

CamScanner

সারসংক্ষেপ

- **বংশগতি :** প্রজননের মাধ্যমে মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বংশগতি বা হেরিডিটি বলে। সংক্ষেপে, যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা হেরিডিটি বলে।
- **জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কার্যপদ্ধতি ও তার বংশানুক্রমিক সঞ্চারণ পদ্ধতি ও ফলাফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স বলে।
- **জিন :** জীবের বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রতম এককে জিন বলে। প্রকৃতপক্ষে, জিন হলো ক্রোমোজোমে বিদ্যমান DNA অণুর এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যা কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে সক্ষম।
- **জেনেটিক কোড :** জেনেটিক কোড হলো DNA-এর সিকোয়েন্স অনুযায়ী সৃষ্ট mRNA এর নিউক্লিওটাইড অণুর এমন সজ্জা বা ক্রম, যা একটি কার্যকরী অ্যামিনো এসিডকে নির্দেশ করে।
- **হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোম :** একই আকৃতি একই জিনের সজ্জারীতি সম্পন্ন দুটি ক্রোমোজোম যাদের একটি পিতা ও অন্যটি মাতা হতে আগত তাদের সমসংস্থ বা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলে। অথবা, ডিপ্লয়েড জীবে আকার, আকৃতি, ক্রোমোমিয়ারের অবস্থান ও সংখ্যা ইত্যাদি দিক হতে দুটি ক্রোমোজোম এক রকম থাকে, এদের একটিকে অপরটির হোমোলগ (সমসংস্থ) বলা হয় এবং দুটিকে একত্রে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম বলে।
- **অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ :** হোমোলোগাস বা সমসংস্থ ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত এক জোড়া জিন যদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তাদের পরস্পরের অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ বলে। অ্যালিলদ্বয় একইধর্মী (যেমন- TT) অথবা একে অপরের বিপরীতধর্মী (যেমন- Tt) হতে পারে।
- **হোমোজাইগাস :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বা অ্যালিলদুটি সমপ্রকৃতির হলে, তাকে হোমোজাইগাস বলে। যেমন- TT মটরশুঁটি উদ্ভিদের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য কিংবা tt মটরশুঁটি উদ্ভিদের খাটো বৈশিষ্ট্যের জন্য হোমোজাইগাস।
- **হেটারোজাইগাস :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বা অ্যালিলদুটি অসমপ্রকৃতির হলে, তাকে হেটারোজাইগাস বলে। যেমন- Tt মটরশুঁটি উদ্ভিদের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জন্য হেটারোজাইগাস।
- **ফিনোটাইপ :** কোনো জীবের প্রকাশিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলে। অথবা, জিনোটাইপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি ফিনোটাইপ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন- লম্বা, খাটো, হলুদ, সবুজ, গোলাকার ইত্যাদি।
- **জিনোটাইপ :** কোনো জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনদ্বয়ের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। অথবা, কোনো জীবের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিনযুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। উদাহরণ- একটি হোমোজাইগাস লম্বা গাছের জিনোটাইপ TT ও হেটারোজাইগাস লম্বা গাছের জিনোটাইপ Tt।
- **একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস :** মেন্ডেলের প্রথম সূত্রকে পৃথকীকরণ সূত্র বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো একসংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস। যেমন- লম্বা ও খাটো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো মনোহাইব্রিড ক্রস।
- **দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস :** মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যকার ক্রস হলো দ্বিসংকর ক্রস বা ডাইহাইব্রিড ক্রস। যেমন- গোলাকার ও হলুদ বর্ণের বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি গাছের সাথে কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনকারী মটরশুঁটি গাছের মধ্যকার ক্রস হলো ডাইহাইব্রিড ক্রস।
- **ব্যাক ক্রস :** অপত্য বংশীয় (F_1 জনু) কোনো জীবের সঙ্গে জনিতৃ জনুর কোনো জীবের অথবা জনিতৃর সদৃশ জিনোটাইপযুক্ত কোনো জীবের সংকরায়ণের পদ্ধতিকে ব্যাক ক্রস বলে। সংক্ষেপে, F_1 বংশের জীবের সঙ্গে পিতামাতার যেকোনো বৈশিষ্ট্যের ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলে।
- **টেস্ট ক্রস :** কোনো জীবের জিনোটাইপ (হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস) নির্ণয়ের জন্য ওই জীবের সঙ্গে হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন (বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন) জিনোটাইপযুক্ত জীবের যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তাকে টেস্ট ক্রস বলে।
- **পৃথকীকরণের সূত্র :** মনোহাইব্রিড ক্রসে পিতামাতা থেকে আগত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরে জনন কোষ সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।
- **স্বাধীন বিন্যাস সূত্র :** দুই (বা ততোধিক) জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ করলে প্রথম অপত্য বংশে (F_1 জনু) শুধু প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে গ্যামিটগুলো জোড়া ভেঙে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়।
- **মেন্ডেলবাদ :** গ্রেগর জোহান মেন্ডেল 1866 সালে বংশগতি নিয়ে গবেষণাকালে দুটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এ সূত্র দুটি মেন্ডেলবাদ নামে পরিচিত। অথবা, মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকে মেন্ডেলবাদ বা মেন্ডেলিজম বা মেন্ডেল তত্ত্ব বলা হয়।
- **মেন্ডেলিয়ান ইনহ্যারিট্যান্স :** মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকে মেন্ডেলিজম বা মেন্ডেলিয়ান ইনহ্যারিট্যান্স বা মেন্ডেলের বংশগতি সূত্র বলা হয়।
- **সাটন ও বোভারি :** বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তাদের মতে বিভিন্ন নির্ধারক জিনগুলো ক্রোমোজোমের উপরে অবস্থান করে এবং ক্রোমোজোমের মাধ্যমে জিনগুলো পরবর্তী জনুতে সঞ্চারণ ঘটার দরুন বংশ পরম্পরায় পিতামাতায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

CamScanner

☑ **অসম্পূর্ণ প্রকটতা :** একটি বৈশিষ্ট্য যদি আরেকটি বৈশিষ্ট্যের ওপর সম্পূর্ণ প্রকট না হয় তাহলে সংকর জীবে উভয়ের মাঝামাঝি একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এ ধরনের ঘটনাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে। অথবা পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের সংকরায়ণে যখন প্রথম অপত্য জনুতে প্রকট জিনটি তার ফিনোটাইপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না, ফলে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যবর্তী একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে, তখন তাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

☑ **সমপ্রকটতা :** সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী প্রকট জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে। অথবা, সংকর জীবে (হেটেরোজাইগাস অবস্থায়) উভয় জিনের বৈশিষ্ট্য যখন একই সঙ্গে প্রকাশ লাভ করে তখন জিনের এই বিশেষ ধর্মকে সমপ্রকটতা বা সহপ্রকটতা বলে।

☑ **লিথাল জিন :** যেসব জিন কোনো জীবের মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যুর কারণ হয়, তাদের লিথাল জিন বলে। অথবা, হোমোজাইগাস অবস্থায় কোনো জিন বহনকারী জীবের মৃত্যু হলে সে জিনকে লিথাল জিন বলে।

☑ **পরিপূরক জিন:** একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যখন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন সমান কার্যকর ভূমিকা পালন করে তখন জিন দুটিকে একে অপরের পরিপূরক জিন বলে।

☑ **এপিস্ট্যাসিস :** একটি জিনের বাহ্যিক প্রকাশ অন্য আরেকটি নন-অ্যালিলিক জিন-কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে এ ধরনের ঘটনাকে এপিস্ট্যাসিস বা নিরোধন বলে। অথবা যে জিন আন্তঃক্রিয়ায় একটি জিন অ্যালিল নয় এমন অপর একটি জিনকে প্রকাশ পেতে বাধা দেয় তাকে এপিস্ট্যাসিস বা নিরোধন বলে।

☑ **দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস :** ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন জিন একে অপরের প্রকট অ্যালিলকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করলে তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অথবা যখন দুটি ভিন্ন জিনের প্রচ্ছন্নধর্মী অ্যালিল একে অপরের প্রকটধর্মী অ্যালিলের প্রকাশে বাধা দান করে তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে।

☑ **পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স :** একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনেকগুলো জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে পলিজেনিক জিন বলে। এই পলিজেনিক জিনের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলে। অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত বহুসংখ্যক জিন যদি কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট ফিনোটাইপের তারতম্য নির্ধারণ করে, তবে সে ক্ষেত্রে জিনগুলোর বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলে। এই প্রকার জিনগুলোকে একত্রে মাল্টিপল জিন বা পলিজিন বলে।

☑ **লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি :** ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে জীবের লিঙ্গ নির্ধারণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া হলো লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি। আর যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত বৈশিষ্টাবলী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ বলে।

☑ **লিংকেজ :** একই ক্রমোজোমে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিত দুই বা ততোধিক জিনের একই সঙ্গে একই গ্যামিটে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে লিংকেজ বলে।

☑ **প্লিওট্রপি :** একটি জিন যখন একাধিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে,তখন এ বিষয়টিকে প্লিওট্রপি বা প্লিওট্রপিজম বলে এবং জিনটিকে প্লিওট্রপিক জিন বলে। মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়ার জিন প্লিওট্রপিক জিনের উদাহরণ।

☑ **সেক্স লিংকড জিন :** সেক্স ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিংকড জিন বলে, যা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

☑ **সেক্স লিংকড ইনহ্যারিট্যান্স :** সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সেক্সলিংকড বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে সেক্স লিংকড ইনহ্যারিট্যান্স বা লিঙ্গ জড়িত বংশগতি বলে। কয়েকটি সেক্সলিংকড বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাস্কুলার ডিস্ট্রফি ইত্যাদি।

☑ **সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার :** মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতির রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের সেক্স লিংকড ডিসঅর্ডার বা লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা বলে। লাল সবুজ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি ইত্যাদি মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত রোগ।

☑ **বর্ণান্ধতা :** যে বংশগত রোগে, কোনো মানুষ বিভিন্ন বর্ণের বিশেষত লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য করতে পারে না বা চিনতে পারে না, সেই প্রকার অস্বাভাবিকতাকে বর্ণান্ধতা বলে।

☑ **ইসিহারা টেস্ট :** এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে মানুষের লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় বর্ণান্ধ ব্যক্তি বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে সব রং দেখতে পায় কিন্তু লাল আর সবুজ রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে না। এ বিশেষ ধরনের পরীক্ষাকেই ইসিহারা টেস্ট বলে।

☑ **প্রোটানোপিয়া :** লাল বর্ণের পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ; সবগুলোকে সাদা মনে হয়। লাল বর্ণান্ধতার অপর নাম।

☑ **ডিউটেরানোপিয়া :** সবুজ বর্ণের পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ। সবুজ বর্ণান্ধতার অপর নাম।

☑ **হিমোফিলিয়া :** মানুষের যে বংশগত রোগের কারণে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধে না তাকে হিমোফিলিয়া বলে।

☑ **রক্ত গ্রুপ :** লোহিত রক্তকণিকায় কতগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে ABO রক্তগ্রুপ বা রক্তগ্রুপ বলে।

☑ **Rh ফ্যাক্টর :** Landsteiner ও Wiener (1940) মানুষের রক্তে একপ্রকার অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুটিনোজেন)-এর উপস্থিতি লক্ষ করেন, যা রেসাস বানরের রক্তে পাওয়া যায়। মানুষের রক্তে বর্তমান এই প্রকার অ্যান্টিজেনকে **Rhesus ফ্যাক্টর**, সংক্ষেপে **Rh ফ্যাক্টর** বলে।

☑ **এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস :** Rh^- মাতার প্রথম সন্তান Rh^+ হলে প্রসবকালে সন্তানের Rh অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে মাতার রক্তে অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর গঠিত হয়। উক্ত মাতার পরবর্তী সন্তান Rh^+ হলে মাতার পূর্বগঠিত অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর দ্বিতীয় সন্তানের Rh অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রক্তভঙ্গন সৃষ্টি করে– এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সন্তানের যে রোগজনিত লক্ষণ সৃষ্টি হয় তাকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (erythroblastosis fetalis) বা HDN (hemolytic disease of the new born) বলা হয়।

☑ **মাল্টিপল অ্যালিল :** কোনো একটি জিনের বহিঃপ্রকাশ যখন দুটির বেশি অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন এই অ্যালিলগুলোকে একত্রে মাল্টিপল অ্যালিল বলে। যেমন– মানুষের ABO ব্লাড গ্রুপ মাল্টিপল অ্যালিল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

CS CamScanner

- **বিবর্তন :** প্রকৃতিতে যে মন্থর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতে উদ্ভূত কোনো সরল জীব থেকে জটিলতর ও উন্নত জীবের উদ্ভব ঘটে তাকে বিবর্তন বা জৈব বিবর্তন বলে। অথবা, কোনো জীবের সরল অবস্থা হতে জটিলতার দিকে পর্যায়ক্রমিক অতি ধীর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বা জৈব বিবর্তন বলে। বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলো হলো ল্যামার্কিজম, ডারউইনিজম এবং নিউডারউইনিজম।
- **অপসারী বিবর্তন :** বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের জন্য উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে একই অঙ্গের বিভিন্ন আকার হয়। এই প্রকার অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (divergent adaptation) বলে। এর ফলে জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের যে বিবর্তন ঘটে, তাকে অপসারী বিবর্তন (divergent evolution) বলে। এ ধরনের বিবর্তনে জীবদেহের সমসংস্থ অঙ্গ গঠিত হয়।
- **অভিসারী বিবর্তন :** উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে ভিন্ন অঙ্গ যখন একই পরিবেশে অভিযোজনের জন্য একই বাহ্যিক আকারযুক্ত হয়, তখন ঐ প্রকার অভিযোজনকে অভিসারী অভিযোজন (convergent adaptation) বলে। এইরূপ অভিযোজনের জন্য সংঘটিত বিবর্তনকে অভিসারী বিবর্তন (convergent evolution) বলে। এ ধরনের বিবর্তনে জীবদেহের সমবৃত্তি অঙ্গ গঠিত হয়।
- **প্রকরণ :** প্রকৃতিতে দুটি জীব কখনও হুবহু এক রকম হয় না। বিভিন্ন কারণে জিন ও ক্রোমোজোমের পুনর্বিন্যাসের ফলে একই প্রজাতিভুক্ত প্রতিটি জীবের মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, কোষীয় এবং আচরণগত যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা বিভেদ বলে।
- **স্ট্রেইন :** নিয়ন্ত্রিত প্রজননের মাধ্যমে গঠিত একই প্রজাতির নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ লক্ষণ বা ট্রেইটযুক্ত (traits) বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস জীবদের স্ট্রেইন (strain) বলে।
- **মিউটেশন বা পরিব্যক্তি :** কোনো প্রজাতির জীবে ক্রোমোজোম ও জিনের আকস্মিক, স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিকভাবে জীবের ফিনোটাইপের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে মিউটেশন (mutation) বা পরিব্যক্তি বলে।
- **ল্যামার্ক :** জৈব বিবর্তনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করেন। ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কিজম অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম নামে প্রসিদ্ধ। 1809 সালে ফিলোসফিক জুওলজিক নামক পুস্তকে তিনি বিবর্তন সম্বন্ধে মতবাদটি প্রকাশ করেন।
- **ল্যামার্কের মতবাদ :** কোনো জীবের জীবনে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। একেই ল্যামার্কের মতবাদ বলা হয়। তাঁর মতবাদ অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার সূত্র নামে পরিচিত।
- **ডারউইনের মতবাদ :** প্রকৃতি তার নিজস্ব নির্বাচনক্ষমতা প্রয়োগ করে উপযুক্ত জীবগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচন করে এবং অনুপযুক্ত জীবগুলোকে নির্মূল করে দেয়। জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা বা না থাকা প্রকৃতির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক নির্বাচনই নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মাধ্যমে অভিব্যক্তির ধারাকে অব্যাহত রাখে। তাই ডারউইনের মতবাদ প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নামে পরিচিত।
- **সমসংস্থ অঙ্গ :** যেসব অঙ্গ উৎপত্তি ও অন্তর্গঠনের দিক থেকে এক হলেও, বাহ্যিক গঠন এবং কাজের ধরনের দিক থেকে আলাদা, তাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে। যেমন- ব্যাঙের অগ্রপদ, গিরগিটির অগ্রপদ, তিমির অগ্রপদ বা ফ্লিপার, কুকুরের অগ্রপদ, মানুষের হাত, বাদুড় ও পাখির ডানা ইত্যাদি।
- **সমবৃত্তি অঙ্গ :** যেসব অঙ্গ কার্যগতভাবে একই ধরনের কিন্তু উৎপত্তি ও গঠনগতভাবে পৃথক, তাদের সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। যেমন- পতঙ্গ, পাখি ও বাদুড়ের ডানা, মৌমাছি ও কাঁকড়া, বিছার হুল, মাছের পাখনা ও তিমি মাছের ফ্লিপার, অক্টোপাসের চোখ ও মানুষের চোখ ইত্যাদি।
- **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ :** প্রাণিদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এ সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। যেমন- মানুষের কানের পেশি, ছেদন দাঁত, আক্কেল দাঁত, অ্যাপেন্ডিক্স, পুচ্ছাস্থি, কক্কিক্স, গায়ের লোম, উপপল্লব, পুরুষের স্তনগ্রন্থির বৃন্ত ইত্যাদি।
- **জীবাশ্ম :** শিলাস্তরে সংরক্ষিত এমন কোনো নিদর্শন যা প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো জীবের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে তাকে জীবাশ্ম বলে। অথবা প্রস্তরীভূত জীবদেহ বা তার অংশ কিংবা জীব অস্তিতে কোনো প্রস্তরীভূত চিহ্ন। জীবাশ্ম বলতে সাধারণত পুরাকালের জীবের বিভিন্ন শিলাস্তরে সংরক্ষিত দেহ বা দেহাংশের ছাপ বা ছাঁচ ইত্যাদি বোঝায়।
- **জীবন্ত জীবাশ্ম :** জীবাশ্ম জীবের সাথে মিলসম্পন্ন জীবিত জীব প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। অথবা, অতীতকালে বিলুপ্ত কোনো জীবের জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য বর্তমানকালে জীবিত কোনো প্রজাতির মধ্যে লক্ষ করা গেলে বর্তমানকালের এসব প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। যেমন- Platypus (*Ornithorhynchus*), *Limulus*, *Peripatus*, *Sphenodon*, *Latimaria* প্রভৃতি জীবন্ত জীবাশ্ম।
- **জীবাশ্মবিজ্ঞান বা প্যালিওন্টোলজি :** জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম নিয়ে গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয় তাকে জীবাশ্মবিজ্ঞান বা প্যালিওন্টোলজি বলে।
- **মিসিং লিংক :** বিবর্তনগতভাবে নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী জীবগোষ্ঠী যারা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং যাদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর জীবেরই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে, তাদের মিসিং লিংক বা লুপ্ত সংযোজক বলা হয়। এরা ট্রানজিশনাল ফসিল হিসেবেও পরিচিত। যেমন- *Archaeopteryx*-এ ধরনের জীবাশ্ম।
- **সংযোগকারী যোগসূত্র :** দুটি পৃথক জীবগোষ্ঠীর (প্রজাতি, শ্রেণি, পর্ব ইত্যাদি ট্যাক্সা) বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মধ্যবর্তী বা সংযোগসাধনকারী জীবদের (বর্তমানে অস্তিত্ব রয়েছে এরূপ) সংযোগকারী যোগসূত্র বা সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিংক বলে। যেমন- *Peripatus*, *Neopilina*, *Chimaera*, *Protopterus*, *Balanoglossus*, Platypus প্রভৃতি।
- **Biogenetic Law :** ভ্রূণ পরিস্ফুটনের বিভিন্ন পর্যায়ে এর সব পূর্বপুরুষের পূর্ণাঙ্গ অবস্থাকে স্মরণ করে অর্থাৎ ব্যক্তিজনি, জাতিজনির পুনরাবৃদ্ধি ঘটায়। এটাই Biogenetic Law বা পুনরাবৃদ্ধি মতবাদ। E. Haeckel এই মতবাদের প্রবক্তা।
- **অভিযোজন :** পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য জীবের মধ্যে যে গঠনগত, শারীরবৃত্তীয়, স্বভাব বা আচরণগত পরিবর্তন দেখা যায় তাকে অভিযোজন বলে।

CamScanner